সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ইতিহাস

অধ্যাপক মোঃ শামছুল আলম

Contents

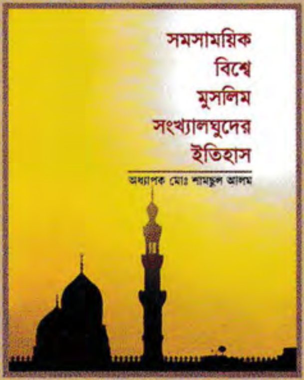

মহানবী (স.)-এর তিরোধানের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইসলাম এক বিশ্ববিজয়ী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রচারধর্মী ধর্ম হিসেবে মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ১৮০ কোটি এবং দিনে দিনে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। যদিও পৃথিবীতে অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে এবং সেসব রাষ্ট্রে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এ ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক দেশ রয়েছে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশ্বব্যাপী ইসলামের এই অভূতপূর্ব প্রচার এবং প্রসার সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে ঐসব ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে ইসলামের প্রসার এবং মুসলিমদের জীবন সংগ্রামের একটি তথ্যচিত্র ও আগামী দিনগুলোতে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

www.waytojannah.com

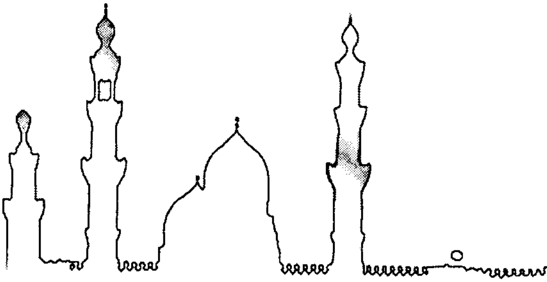

সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ইতিহাস

অধ্যাপক মোঃ শামছুল আলম

অবসর

www.waytojannah.com

এ বইয়ের সমস্ত তথ্য-উপাত্ত-পরিসংখ্যানের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ লেখকের।
এ ব্যাপারে কোনো অবস্থাতেই প্রকাশক দায়বদ্ধ নন।

©
অধ্যাপক মোঃ শামছুল আলম

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৪

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
প্রতীক ডট ডিজাইন

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8797-03-7

Shamoshamoik Bishwae Muslim Sonkhaloghuder Itihas
(History of Muslim Minorities in the Contemporary World) by Prof. Md Shamsul Alam.
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road. Sutrapur. Dhaka-1100
First Edition : October 2014. Price : Taka 150.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬৮০১৫৩৭০৭

Website : **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com
Online Distributor | www.rokomari.com, Phone : 16297, 01833168190
www.akhoni.com. Phone : +88 096 11 55 77 88

www.waytojannah.com

উ ৎ স র্গ

যুগে যুগে যে সমস্ত মর্দে মুজাহিদগণের অক্লান্ত
পরিশ্রমের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের
প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং ইসলামের স্বকীয়তা রক্ষায় যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদের
স্মৃতির প্রতি
এবং
আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মৌলভী বদিউর রহমান
আমার শ্রদ্ধেয় মাতা জয়তুনেন্নেছা
এবং
আমার স্নেহাস্পদ পুত্র ও কন্যা
যথাক্রমে
মোঃ রেজাউল করিম নাহিদ
ও
জান্নাতুল ফেরদাউস প্রিয়াংকা
এবং
আমার প্রিয়তমা স্ত্রী
সাইয়েদা নাসরিন সুলতানা ডেইজীকে
আল্লাহ এঁদের সবাইকে ইহকালে সম্মান ও নিরাপত্তা দান করুন
এবং
পরকালে জান্নাত নছিব করুন ॥

www.waytojannah.com

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে অবশেষে 'সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ইতিহাস' নামক বইখানি প্রকাশিত হল। এজন্য আল্লাহর দরবারে হাজার শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে অবসর প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী জনাব এ কে এম ফজলুর রহমান এবং এই বই প্রকাশের ব্যাপারে উক্ত সংস্থার যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত ছিলেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহামহিম রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের এই শ্রমের উত্তম প্রতিদান দেন।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে দুএকটি কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছি। বইটি মূলত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য অধুনা প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসরণ করে লেখা। তবে বিশেষ শ্রেণীর জন্য লেখা হলেও সাধারণ পাঠকরাও এতে উপকৃত হবেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত মুসলিম নাগরিকদের অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত সিলেবাসটি কিছুটা জটিল ও দীর্ঘ। কারণ এ বিষয়ের ওপরে আমাদের দেশে সহজলভ্য তেমন বইপত্র নেই। দ্বিতীয়ত, অধ্যায়গুলো এত ব্যাপক যে এর প্রতি অধ্যায় নিয়ে এক একটি বই রচনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে বইটির অধ্যায়গুলো যথাসম্ভব ছোট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু একটি সিলেবাসকে অনুসরণ করে বইটি লেখা হয়েছে এবং সিলেবাস প্রণেতাগণ সতর্কভাবে অনেক দেশের নাম বাদ দিয়েছেন, সুতরাং আমাদেরকেও সেভাবেই অগ্রসর হতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ। সেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। অথচ সে দেশকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যদি করা হতো তা হলে শিক্ষার্থীরা যেমন তেমনিভাবে সাধারণ পাঠকরাও ভারতে বসবাসরত মুসলিম নাগরিকদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারতেন।

বক্ষ্যমাণ বইটিতে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দ্রুত বিকাশ ও প্রসার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণত ইসলামবিদ্বেষী লেখক ও ঐতিহাসিকগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে 'তরবারি তত্ত্ব' ও 'ধর্মীয় গোঁড়ামি তত্ত্ব' উপস্থাপন করে থাকেন। আসলে

www.waytojannah.com

ntents

এ তত্ত্বগুলো শুধুমাত্র ইসলাম বিদ্বেষের একটি নমুনা, বাস্তবে যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৭৩ সালে প্রাচ্য বিশারদ প্রফেসর ম্যাক্সমুলার ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে খ্রিস্টান মিশনারিদের এক সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি অ–খ্রিস্টান জাতিসমূহের সামনে খ্রিস্টধর্মের মূল বাণীকে তুলে ধরার জোরালো আহ্বান জানান। তিনি যে সময় এ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, তখন সারা বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২০ কোটি। তাঁর সেই ভাষণের পর ২০০৭ সালের মধ্যে মাত্র ১৩৪ বছর সময়ের ব্যবধানে সারা বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ১৫০ কোটিতে পৌঁছে যায় এবং এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৮০ কোটিতে পৌঁছেছে। তা হলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এখন তো মুসলমানরা বিশ্ব শক্তির নিয়ামক নয়। তা হলে কোন সে অস্ত্র, কোন সে শক্তি যার কারণে বিশ্বের অমুসলমানরা দলে দলে এখনো ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে! সে শক্তি হল ইসলামের আদর্শিক শক্তি এবং ইসলামের পবিত্র জীবনাচার, যা মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির সহজ–সরল ও সুনির্দিষ্ট পথ দেখায়।

পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে মুসলমানরা কস্মিন্‌কালেও কোনো অভিযান পরিচালনা করেনি, অথচ সেসব দেশে প্রচুর সংখ্যক মুসলমানের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ঐতিহাসিকরা এই মর্মে একমত যে, মুসলিম বণিকরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যেহেতু ইসলাম ব্যবসা–বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছে, সেহেতু বাণিজ্যব্যপদেশে বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বণিকদের আগমন ঘটেছে। এসব বণিক যেসব নতুন জনপদে গমন করেছেন, সেখানে তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু এবং ক্ষুদ্র আকৃতির একটি দল। তাঁদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর অন্য একটি ধর্ম তথা ইসলাম জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া কল্পনাও করা যায় না। প্রকৃত ব্যাপারটি হল, এই বণিকরা নতুন জনপদে শুধু ব্যবসাই করতেন না, তাঁরা ইসলামও প্রচার করতেন। তাই ঐ সমস্ত জনপদের অধিবাসীরা ইসলামের আদর্শের বাণী শুনে মুক্তির উপায় হিসেবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে—ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে—কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নয়। অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন যে, ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত টুরসের (Battle of Tours) যুদ্ধে আব্দুর রহমান আল–গফিকী যদি ফ্রাঙ্ক রাজ চার্লস মর্টেলের হাতে পরাজিত না হতেন তা হলে আজকে ইউরোপে গির্জার ঘণ্টাধ্বনির পরিবর্তে মসজিদের মিনার হতে আজানের সুর–লহরি ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত হতো। কিন্তু টুরসের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য দূর পাশ্চাত্যের সীমান্ত রেখা টেনে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা আর সামনে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আজকের ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামের যেভাবে বিস্তার ঘটে চলেছে তা ইসলামবিরোধীদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা ইসলামের এ সম্প্রসারণ তাদের 'তরবারি তত্ত্ব' ও 'ধর্মীয় গোঁড়ামি তত্ত্ব'কে ইতোমধ্যে অসত্য প্রমাণ করে ফেলেছে। তাই তারা আবার নতুন কোন তত্ত্ব হাজির করেন—সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পৃথিবীতে বহুল প্রচারিত ও অনুসরণকৃত যে ছয়টি প্রধান ধর্ম রয়েছে সেগুলোকে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এর একটি হল প্রচারধর্মী অন্যটি হল অপ্রচারধর্মী। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইসলাম প্রচারধর্মী ধর্মের অন্তর্গত।

www.waytojannah.com

এ ছাড়া খ্রিস্টান ও বৌদ্ধধর্মও প্রচারধর্মী ধর্মের শ্রেণীভুক্ত। অথচ প্রচারধর্মী বৈশিষ্ট্যের শ্রেণীভুক্ত হয়েও ইসলামে কেন্দ্রীয়ভাবে সাংগঠনিক ভিত্তিতে কোনো প্রচারণা সংঘ নেই। অথচ খ্রিস্টান জগতে প্রথম থেকেই ভ্যাটিকানসহ অন্যান্য চার্চ সংগঠনে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োজিত থাকত এবং তাদেরকে পুরোহিততন্ত্রের পক্ষ থেকে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হতো। বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এরকম কোনো সংগঠন না থাকলেও মুসলমানরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নিয়েছে। তাই মুসলমানরা যে অঞ্চলে গিয়েছে সেখানে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এক একজন দাই বা ধর্ম প্রচারকের ভূমিকা পালন করেছে। যেহেতু মুসলমানরা মনে করেন যে, মুক্তির জন্য আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারীর [রাসুল (স.) ব্যতীত] প্রয়োজন নেই। তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁকে মুক্তিলাভ করতে হবে এবং ইসলাম প্রচারের জন্য কোনো পুরোহিতের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। তাই সে নিজ উদ্যোগে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে নিজের পরকালীন মুক্তির পথকে সহজ ও উন্মুক্ত করার জন্য ব্রতী হয়েছেন। আর এভাবেই বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে।

এ কথা আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের এই প্রচার এবং প্রসারের কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, অনেক ঘাত–প্রতিঘাত ও জুলুম–নির্যাতন সহ্য করে ইসলামের অকুতোভয় বীর সেনানীরা ইমানের মশাল নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন এবং হেদায়েতের পথে মানুষকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মহানবী (স.)–এর ইন্তেকালের পরে ভণ্ডনবীদের আন্দোলন, স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ, মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, কারবালার হত্যাকাণ্ড, খ্রিস্টান জগতের ক্রুসেড ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ওপর হামলে পড়া এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল্লাহর গজবরূপে আবির্ভূত মোঙ্গল যাযাবরদের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ওপর আক্রমণ ও ধ্বংসসাধন মুসলমানদের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে এ সমস্ত দুর্যোগ ও দুর্বিপাক বিদূরিত হয়েছে এবং ইসলাম তার স্বমহিমায় তেজোদ্দীপ্ত হয়েছে। ইসলামের অফুরন্ত আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তি আবার তাদেরকে ঘুরে দাঁড়াবার সাহস জুগিয়েছে এবং তারা সফলকাম হয়েছে। কবির ভাষায় বলতে হয়—

'কত্‌লে হোছাইন, হোছাইন নেহী
আছল মে মরগে ইয়াজিদ হ্যায়,
ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবাল কে বাদ।'
অর্থাৎ হুসাইনের (নবী দৌহিত্রী) মৃত্যু মৃত্যু নয় আসলে এটা ছিল
ইয়াজিদের মৃত্যুর নামান্তর,
ইসলাম জীবিত হয় কারবালাতুল্য ঘটনার পরপর।

তাই ঘন তমসাচ্ছন্ন বিপর্যয়ের পরও ইসলামের আধ্যাত্মিক সন্তানরা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন রাখতে সফলকাম হয়েছে।

পরিশেষে ভূমিকার কলেবর না বাড়িয়ে এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই যে, এই বইয়ের শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি এবং প্রবন্ধের তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ

www.waytojannah.com

ও প্রবন্ধ থেকে আমি অনেক তথ্য ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের লেখকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার প্রিয় ছাত্র বর্তমানে সহকর্মী মাহবুবুর রহমান এই বই লেখার ব্যাপারে আমাকে উদ্দীপ্ত করে এবং প্রাসঙ্গিক বইপত্র জোগাড় করে দিয়ে আমার শ্রম অনেকখানি লাঘব করে দেয়ার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বইতে তথ্যগত অথবা বানানগত ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। পাঠকবৃন্দকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। যাদের উদ্দেশে এই বইটি লেখা হল তারা যদি এর মাধ্যমে কিছুমাত্র উপকৃত হন তা হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ্ সবাইকে এই বই থেকে উপকৃত হবার সুযোগ দান করুন। আমিন।

প্রফেসর মোঃ শামছুল আলম
১৬৩, সেঞ্চুরী অ্যাপার্টমেন্ট
পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা-১২১৫

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের সম্প্রসারণশীলতা
পৃষ্ঠা : ১৫–২২

দ্বিতীয় অধ্যায়
'Minority' বা সংখ্যালঘু বলতে কী বুঝায়?
পৃষ্ঠা : ২৩–২৪

তৃতীয় অধ্যায়
নেপালের মুসলিম অধিবাসী
পৃষ্ঠা : ২৫–২৯

চতুর্থ অধ্যায়
শ্রীলঙ্কায় ইসলামের আগমন
মুসলমানদের বিকাশ, বর্তমান অবস্থা ও জীবন সংগ্রাম
পৃষ্ঠা : ৩০–৩৭

পঞ্চম অধ্যায়
ফিলিপাইনের মুসলিম সম্প্রদায়
আগমন, বিকাশধারা ও বর্তমান অবস্থা
পৃষ্ঠা : ৩৮–৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়
সিঙ্গাপুরে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন
পৃষ্ঠা : ৪৩–৪৬

সপ্তম অধ্যায়
মায়ানমার (বার্মা)
রোহিঙ্গা মুসলিমদের ইতিহাস এবং তাদের
বর্তমান সমস্যা ও জীবনধারা
পৃষ্ঠা : ৪৭–৫৭

www.waytojannah.com

অষ্টম অধ্যায়
জাপান : দূর প্রাচ্যে ইসলামের আগমন
মুসলিম বিকাশধারা ও বর্তমান অবস্থা
পৃষ্ঠা : ৫৮–৬২

নবম অধ্যায়
চীনে ইসলামের আগমন : উইঘুর মুসলিম
ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়
পৃষ্ঠা : ৬৩–৭১

দশম অধ্যায়
War on terrorism বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
পৃষ্ঠা : ৭২–৭৮

একাদশ অধ্যায়
ইউরোপে ইসলাম : মুসলিম সমাজের বিকাশ
ধারা ও বর্তমান অবস্থা
পৃষ্ঠা : ৭৯–৮৯

দ্বাদশ অধ্যায়
উত্তর আমেরিকায় মুসলমান
পৃষ্ঠা : ৯০–১০৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়
দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার
(আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচিতি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার, উপসংহার)
পৃষ্ঠা : ১০৪–১১২

চতুর্দশ অধ্যায়
কানাডায় ইসলাম ও মুসলমান
একটি পর্যালোচনা
পৃষ্ঠা : ১১৩–১১৮

পঞ্চদশ অধ্যায়
উপসংহার
পৃষ্ঠা : ১১৯–১২৩

গ্রন্থপঞ্জি
পৃষ্ঠা : ১২৫–১২৮

www.waytojannah.com

সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ইতিহাস

www.waytojannah.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের সম্প্রসারণশীলতা

ইসলামের সম্প্রসারণশীলতা

ইসলাম একটি বর্ধিষ্ণু ধর্ম। দিনে দিনে এর পরিধি ও ব্যাপ্তি বেড়েই চলেছে। আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে এশিয়ার পশ্চিমাংশে আরব উপদ্বীপে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ রসুল হজরত মুহম্মদ (স.)–এর আবির্ভাব ও নবুয়ত প্রাপ্তির মাধ্যমে তাওহিদের যে বাণী তিনি বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন—চৌদ্দশত বছর ধরে আজো সে বাণী পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত সীমায় অনুরণিত এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইসলাম ধর্মবিশ্বাস মতে, এই পৃথিবীতে হজরত আদম (আ.) থেকে মহানবী (স.) পর্যন্ত যতজন নবী–রসুল পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই ধর্ম ছিল ইসলাম। এ সমস্ত নবী–রসুলদের অনেককে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবও প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঐ সমস্ত নবী ও রসুলদের তিরোধানের পর ধর্মাধিষ্ঠানের নেতৃবর্গ সে সমস্ত কিতাবকে এমনভাবে বিকৃত করে যে তা আর কোনোভাবে ঐশী বাণী হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। যার পরিপ্রেক্ষিতে মানবজাতি পথভ্রষ্ট হয়ে শিরক ও পাপাচারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। সমগ্র বিশ্বের মতো আরব উপদ্বীপও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল আরো ভয়ানক। বিশ্বমানবতাকে এই পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করে হেদায়েত ও কল্যাণের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার একজন মহান মুক্তিদূতের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। আরব দেশের তৎকালীন আইয়্যামে জাহেলিয়ার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক আমীর আলী 'The History of the Saracene' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, 'The stage was set, the moment was Psychological for the appearence of a great national and religious leader' অর্থাৎ একজন জাতীয় ও ধর্মীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ ছিল প্রস্তুত এবং সময়টা ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ। সমগ্র মানবজাতির এহেন ক্রান্তিকালে আল্লাহরাব্বুল আলামিন সমগ্র বিশ্বাবাসীকে হেদায়েতের পথে পরিচালনার জন্য বিশ্বনবী হজরত মুহম্মদ (স.)–কে এ ধরাধামে প্রেরণ করেন। মহানবী (স.) ৫৭০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রি. তিনি নবুয়ত লাভ করেন এবং তাঁর উপর ওহির মাধ্যমে কোরান নাজিল হতে শুরু করে।

www.waytojannah.com

কোরান (The Quran) নাজিল হওয়ার মাধ্যমে মহানবী (স.) নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেন এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে আল্লাহর একাত্মবাদ (অহদানিয়্যাত) প্রচার করা শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "তোমরা বল, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো 'ইলাহ' বা উপাস্য নেই তা হলে তোমরা মুক্তি পাবে।[১]"—আল কোরান। সাথে সাথে তিনি ইসলামকে সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহতায়ালা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপন করেন।[২] তৎকালীন 'শির্ক' এবং গোমরাহি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ইসলামের এ ঘোষণা ছিল এমন এক বিপ্লবী আহ্বান যা সারা বিশ্বের তাগুতি শক্তির হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছিল, আর পৃথিবীর সকল খোদাদ্রোহী শক্তি সম্মিলিতভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করতে পাহাড়সম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে মহানবী (স.)–এর নেতৃত্বে প্রতিবন্ধকতার সকল স্তর অতিক্রম করে ইসলাম এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিজয়ী জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

বিশ্বব্যাপী ইসলাম দ্রুত প্রচার ও প্রসার লাভ করার কারণ

(ক) মানুষের আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণের ক্ষমতা : তৎকালীন জড়বাদী ও পৌত্তলিকতাবাদী বিশ্বে পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারের কারণে যে আধ্যাত্মিক শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা পূরণ করার মতো সামর্থ্য সমকালীন অন্য কোনো ধর্মের মধ্যে বর্তমান ছিল না। ইসলামের মধ্যে মানুষের সেই আত্মিক চাহিদা পূরণের সক্ষমতা থাকার কারণে মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(খ) ইসলামের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য : ইসলামি জীবন বিধান ও আদর্শের মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য রয়েছে—যদি তা কোনো মানুষের সামনে যথাযথ ও সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, তা হলে যে কোনো ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করতে বাধ্য। ইসলামের এই সৌন্দর্য মানুষকে তা গ্রহণ করতে আকৃষ্ট করে।

(গ) মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম : ৬৩২ খ্রি. মহানবী (স.)–এর সাথে বিদায় হজের সময় এক থেকে দেড় লক্ষ সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। জাবালে রহমতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তিনি যখন ঘোষণা করলেন—'তোমরা যারা এখানে উপস্থিত, তারা অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার এ বাণী পৌঁছে দেবে।'[৩] তাফসিরকারকগণ লিখেন যে, তাঁর এই মুখ নিঃসৃত বাণী শোনার পর সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের উট, ঘোড়া প্রভৃতি বাহনগুলোর মুখ যার যেদিকে ফেরানো ছিল সেদিকে চালাতে শুরু করেন এবং যেখানে গিয়ে সেগুলো থামে সেখানেই ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কোনো জায়গায় গিয়ে যদি সাহাবীগণ দেখতেন তার আগে অন্য কেউ সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে, তা হলে যিনি পরে পৌঁছেছেন তিনি সে জায়গা পরিত্যাগ করে আরো সামনে অগ্রসর হতেন এবং যে সমস্ত জনপদে ইসলামের বাণী পৌঁছেনি সমস্ত জনপদে ইসলাম প্রচার শুরু করতেন।

(ঘ) দাই ও মুসলিম বণিকদের সীমাহীন পরিশ্রমের ফল : ইসলাম সব সময় ব্যবসায়কে উৎসাহিত করেছে। মুসলিম বণিকরা যখন ব্যবসায় উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করতেন, তখন তারা তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্মের সাথে সাথে দাইয়ের ভূমিকা পালন করে ইসলাম প্রচারের কাজও করতেন। এভাবে ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

www.waytojannah.com

দূর-দূরান্তে দ্রুত প্রচার এবং প্রসার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Arnold বলেন, 'The spread of Islam in India and other part of the world is in the quiet unobstrusive labours of the preacher and the trader who have carried their faith into every quater of the globe.' অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ইসলামের বিস্তৃতি ছিল ঐ সমস্ত ধর্ম প্রচারক এবং ব্যবসায়ীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল, যারা পৃথিবীর যে প্রান্তে গিয়েছেন সেখানে তাদের ধর্মবিশ্বাসকেও সাথে করে নিয়ে গেছেন।

(ঙ) ইসলামের বিজয়াভিযান : মহানবী (স.)-এর ইন্তেকালের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইসলামের অনুসারীরা এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে বিজয়াভিযানে বেরিয়ে পড়ে। যার ফলে তারা এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে যায়। খোলাফায়ে রাশেদীনের অভিযানের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তির পর উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য স্পেন হতে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের সিন্ধু এবং আটলান্টিক জলধি হতে চীনের কাশগড় পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এজন্য উমাইয়া শাসনামলকে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বর্ণযুগ বা Golden age of Muslim expanism বলা হয়ে থাকে। এই সুবিশাল এলাকায় মুসলিম বিজেতারা তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে যান। বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামের নতুন জীবনাদর্শের সাথে পরিচিতি লাভ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

(চ) ইসলামের সার্বজনীনতা : ইসলামের আহ্বান হলো সার্বজনীন। এটা কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা অধিবাসীর জন্য নাজিল করা হয়নি। বরঞ্চ মহানবী (স.)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল, সমগ্র বিশ্ববাসী ও প্রাণিজগতের জন্য এবং সকল সৃষ্টির জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মহানবী (স.)-এর আহ্বান তথা ইসলামের আহ্বান হচ্ছে সকলের কল্যাণের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য। ইসলামের এ আহ্বানের মর্যাদা যারা উপলব্ধি করেছে তারাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে ঐতিহাসিক P. K. Hitti বলেন, 'If all the world was united under one leader, then Muhammad (sm.) would have been the best fitted man to lead the people of various caste, creed and dagmas to peace and happiness.' অর্থাৎ যদি সমগ্র বিশ্বকে একজন নেতার অধীনে আনা সম্ভব হতো তা হলে মহানবী (স.) হতেন সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি ধর্ম, বর্ণ এবং মতবাদ নির্বিশেষে সবাইকে শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হতেন। এটিই ইসলামের সার্বজনীনতা ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রসারের অন্যতম একটি কারণ।

(ছ) মহানবী (স.)-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব : মহানবী (স.)-এর দূরদর্শী নেতৃত্বও ছিল ইসলামের দ্রুত সম্প্রসারণের সবচাইতে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তাঁর সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চিন্তাধারা, সম্মুখদর্শিতা ও দূরদর্শিতা (Beforesightness and foreshightness), পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা এবং তাঁর চিন্তা-চেতনার সঠিকতা ইসলামকে দ্রুত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হিজরতের মাধ্যমে মহানবী (স.)-এর মদিনা গমন এবং মদিনার সনদের (Charter of Madina বা মিছাকুল মদিনা) মাধ্যমে একটি জাতি-রাষ্ট্র গঠন, হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে গেলেও দূরবর্তী সফলতার দিকে লক্ষ্য রেখে তা অনুমোদন, ত্বরিত অভিযান এবং অভিযানকে সফল করার জন্য নতুন নতুন কৌশল নির্ধারণ তাঁর নেতৃত্বের সক্ষমতাকে

www.waytojannah.com

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। এজন্য ঐতিহাসিক P. K. Hitti তার 'History of the Arabs' গ্রন্থে বলেছেন, 'The seer in him now receds in to the background and the practical man of politics come to the fore.' অর্থাৎ মহানবী (স.)–এর অন্তর্দ্রষ্টা তাঁর জীবনের পটভূমিকায় স্থিতি লাভ করল এবং সবার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাজনীতির এক বাস্তব মানুষ।

দুটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

ইসলামের আবির্ভাবের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এর দ্রুত প্রচার ও প্রসার পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে আরব জাতির কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না কোন সে জাদুর বলে একশত বছরের মধ্যে ভারতের প্রান্তদেশ থেকে আটলান্টিকের তটরেখা পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, তা আজো গবেষণার বিষয়। ইসলামবিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ ইসলামের এ অভাবিত সাফল্য ও অগ্রগতিকে দুটি মতবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, যা ইতোমধ্যে সভ্য পৃথিবী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ দুটি মতবাদ হলো :

(ক) Theory of sword বা তরবারি তত্ত্ব।

(খ) Theory of religious fanaticism বা ধর্মীয় গোঁড়ামি তত্ত্ব।

Theory of sword-এর মূল কথা হলো মুসলমানরা সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাজির হয়েছে এবং মানুষকে বলেছে Accept Islam or sword অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ কর নতুবা হত্যা করা হবে। সুতরাং মানুষ তরবারির ভয়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে নবাগত ইসলামকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

আর Theory of religious fanaticism বা ধর্মীয় গোঁড়ামি তত্ত্বের মূল কথা হল The uprise of Islam was the victory of orthodoxism/fanaticism upon the peaceful and tolarent people অর্থাৎ ইসলামের উত্থান ছিল শান্ত ও সহিষ্ণুলোকদের উপর গোঁড়ামির জয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু ইসলামবিদ্বেষী ঐতিহাসিক ইসলামের এই অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রতিহত অগ্রযাত্রার মূল রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়ে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের উপর কালিমা লেপন করার মানসে উপরে উল্লিখিত দুটি তত্ত্ব বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। আশা ও স্বস্তির বিষয় এই যে, অপর শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ যারা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবলোকন করেছেন তারা ইসলামবিদ্বেষী ঐতিহাসিকদের তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়েছেন এবং সভ্য পৃথিবীর আলোকিত সমাজ উপর্যুক্ত দুটি মতবাদকেই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। বরঞ্চ এসব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কারো উপর বল প্রয়োগ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। কেননা কোরানে বল হয়েছে,[১] 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।' কোরানের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে অর্থাৎ ইসলামের পথে মানুষকে ডাকো ঠিকমতো ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে যুক্তি–তর্ক উপস্থাপন কর সদ্ভাবে উত্তম পদ্ধতিতে।[৫] যেহেতু কোরান হচ্ছে ইসলামের মূল গ্রন্থ এবং এ গ্রন্থের নির্দেশনা পালন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক এবং অপরিহার্য, সেহেতু কোরানে যেখানে

www.waytojannah.com

ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে বল প্রয়োগ অথবা ধর্মীয় উগ্রতার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করার প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না।

আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রথম থেকেই মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিশেষ সংগঠন বা দল ছিল না। যেমনিভাবে খ্রিস্টান জগতের নিয়ন্ত্রক ভ্যাটিকান সিটির পোপগণ তাদের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য আলাদা সেল গ্রুপ গঠন করেছিলেন এবং পোপগণ খ্রিস্টধর্মের প্রচারের স্বার্থে যে কোনো খ্রিস্টান রাজাকে যেভাবে নির্দেশ দিতেন, তারা সেভাবেই খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে এরকম কোনো আলাদা সংগঠনই ছিল না আর না ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে এক একজন মুসলমান ছিলেন এক একজন দাই বা ধর্ম প্রচারক। তারা যেখানে গেছেন, সেখানে নিজ উদ্যোগে ইসলাম প্রচার করেছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন বণিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ব্যবসায় উপলক্ষে গমন করেছেন এবং ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদনের ফাঁকে ফাঁকে ইসলাম প্রচারেও সচেষ্ট থেকেছেন। এভাবে ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামের বাণী পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যায়।

এখানে একটি কথা অবশ্যই স্মরণে আনা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিগতভাবে অথবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কেউ যদি কোনো নতুন দেশ বা এলাকায় গমন করে, তা হলে সেখানে সে, ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী সংখ্যালঘু হবে এবং স্থানীয়দের চাইতে দুর্বল হবে। সুতরাং তার পক্ষে শক্তি বা বল প্রয়োগ করে কাউকে ধর্মান্তরিত করা খুবই কঠিন কাজ, বরঞ্চ তাকে তার আচার-ব্যবহার এবং বিজ্ঞতার সাথে তার ধর্মের নির্দেশনাবলি ও লক্ষ্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, স্থানীয় জনগণের মনের চাহিদা ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হতে হবে। তা হলে জনগণ ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হবে। এভাবে মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা স্বীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমভিব্যাহারে জনগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন এবং তারা তা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মুসলিম বণিকগণ অথবা দাই (প্রচারক) যেখানেই পৌঁছেছেন সেখানে তারা তাদের মূল্যবোধ, জীবনাচার এবং ধর্মীয় অনুশাসনকে সমুন্নত রেখেছেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তা পর্যবেক্ষণ করেছে এবং মুসলমানদের মানবতাবোধ ও উন্নত চরিত্র তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারকরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। বাতিল এবং পুরোহিতগণ কর্তৃক রচিত ও চর্চিত ধর্মের নামে মিথ্যার বেসাতি করে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং জনগণকে শোষণ করার অপকৌশল সাধারণ জনগণের নিকট সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাই যখনই তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে তখনই তারা ইসলামকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে। কেননা ইসলাম হচ্ছে ফিতরতের ধর্ম বা প্রকৃতির ধর্ম। মানব প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের যে মৌল সন্নিবেশ করে দেয়া হয়েছে সে আনুগত্যের আগ্রহে সে হেদায়েতের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, আর যখনই সে ঐ হেদায়েতের আওয়াজ শ্রবণ করে তখনই তার অন্তরাত্মা সে ডাকে সাড়া দিতে শুরু করে আর বলে ওঠে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ বা উপাস্য নেই। এভাবে ইসলামের আদর্শই তাকে বিশ্বব্যাপী অপ্রতিহত করে তুলেছে, অন্য কোনো কিছু নয়।

www.waytojannah.com

এরপর চিন্তা করা যেতে পারে মুসলিম সমর শক্তির কথা। মহানবী (স.)–এর ইন্তেকালের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মুসলমানগণ এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে যায়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পর উমাইয়া আমলে চীনের কাশগড় থেকে আটলান্টিকের তটরেখা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কিন্তু একথা কখনো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, মুসলিম শাসকরা তাদের বিজিত এলাকার প্রজাসাধারণকে শক্তি প্রয়োগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। যদি কেউ এমন কথা উচ্চারণ করে তা হলে তা হবে সত্যের অপলাপ। বিজিত এলাকায় ইসলামের বিস্তার লাভের দুটো কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথমত বিজিত এলাকায় মুসলমানদের উপস্থিতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। ইসলাম ধর্মের বাণী ও ইসলামি সভ্যতার প্রকৃষ্ট দিকগুলো তাদের সামনে উন্মোচিত হয়। তাই বিজিত অঞ্চলের লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, যে কারণটি উল্লেখ করা যায় তা হচ্ছে অর্থনৈতিক সুবিধা। আর তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত এলাকার জনগণকে 'জিম্মি' হিসেবে গ্রহণ করা হতো এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসা হতো। এজন্য তাদেরকে 'জিজিয়া' নামে একটি নিরাপত্তা কর (poll tax) দিতে হতো। তা ছাড়া অমুসলিমদের ভূমিসমূহ 'খারাজ' ভূমি হিসেবে গণ্য করা হতো। খারাজ ভূমির কর ছিল উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক। অপর পক্ষে মুসলমানদের ভূমিকে 'উশরী' ভূমি হিসেবে গণ্য করা হতো। যার কর ছিল $^{১}/_{১০}$ ভাগ ক্ষেত্র বিশেষে $^{১}/_{২০}$ ভাগ। তা ছাড়া মুসলমানগণ সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে পারত এবং আকর্ষণীয় বেতন–ভাতা ছাড়াও গনিমতের মালের অংশ পেত। এ সমস্ত সুবিধার কারণে বিজিত অঞ্চলের অমুসলিমগণ অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করা শুরু করে। উমাইয়া খলিফাগণ মানুষদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বল প্রয়োগ করা তো দূরে থাক বরঞ্চ ইসলাম গ্রহণ করাকে তারা অপছন্দ করত। কেননা তাদের ভয় ছিল যদি এভাবে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে রাষ্ট্র জিজিয়ার আয়, খারাজের আয় থেকে বঞ্চিত হবে এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হবে। তারপরও যখন নও–মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন খলিফা আব্দুল মালিক নও–মুসলিমদের উপর 'জিজিয়া' এবং 'খারাজ' ধার্য করেছিলেন, যদিও এটি শরিয়তসম্মত ছিল না। পরবর্তী সময়ে খলিফা ওমর–ইবনে–আব্দুল আযীয নও–মুসলিমদের উপর থেকে 'জিজিয়া' ও 'খারাজ' প্রত্যাহার করেন। এবং নও–মুসলিমদেরকেও তিনি স্বাভাবিক মর্যাদা দান করেন।

তারপরও যারা শক্তি প্রয়োগের তত্ত্ব প্রচার করেন তাদের উদ্দেশে এখানে দু'টো উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো। দুটি দেশের দুটি উদাহরণ—একটি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তীয় দেশ আরেকটি পশ্চিমাঞ্চলের দেশ। একটির নাম ভারতবর্ষ আরেকটি হলো ইউরোপের স্পেন। ৭১২ খ্রি. মুহাম্মদ–বিন–কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর বিভিন্ন সময় বাদ দিয়েও ১২০৬ খ্রি. সুলতানি আমলের শুরু থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মুঘল শাসনামলের পতন পর্যন্ত প্রায় সাতশত বছর মুসলমানগণ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এত শত বছর রাজত্ব করার পরও এখনো দিল্লি হিন্দু অধ্যুষিত। পুরো ভারতবর্ষ না হোক দিল্লিসহ আরো যে সমস্ত শহর আছে, যেগুলো থেকে মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো, সেগুলোকে যদি শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করা হতো তা হলে সাতশত বছর নয়, সাত মাসেরও প্রয়োজন হতো না।

www.waytojannah.com

খলিফা আল–ওয়ালিদের রাজত্বকালে ৭১২ খ্রি. তারিক–বিন–জিয়াদ এবং মুসা–ইবনে–নুসায়েরের নেতৃত্বে মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে। স্পেন বিজয়ের পর ১৪৯২ খ্রি. পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশের উথান–পতনের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা স্পেন শাসন করে। প্রায় আটশত বছর পর্যন্ত যে স্পেন মুসলমানরা শাসন করেছিল, যে স্পেনকে ইউরোপ মহাদেশের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মুসলমানরা গড়ে তুলেছিল, যে স্পেনকে মুসলিম শাসনামলে 'Light house of Europe' বা ইউরোপের বাতিঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো, সেই স্পেনেই খ্রিস্টানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এই খ্রিস্টানগণই ১৪৯২ খ্রি. মুসলমানদিগকে বাস্তচ্যুত করে স্পেন থেকে চিরতরে বহিষ্কার করেছিল। Theory of sword বা তরবারি তত্ত্ব বা Theory of military force বা সামরিক শক্তিতত্ত্ব যারা জাহির করে তারাই বলুক মুসলমানরা কার উপরে শক্তি প্রয়োগ করেছিল। মুসলমানরা যদি শক্তিই প্রয়োগ করত, তা হলে আজকের স্পেনের চিত্র এরকম হতো না, এর Political Scenario বা রাজনৈতিক দৃশ্যপট হতো ভিন্ন রকম। তাই ইসলামের প্রচার এবং প্রসারে শক্তি প্রয়োগের কোনো স্থান নেই, যারা শক্তি প্রয়োগের কথা বলে তারা মিথ্যা বলে। বরঞ্চ ইসলামি জীবন বিধানের শ্রেষ্ঠত্বই হলো ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের অন্যতম কারণ।

অপর পক্ষে যে খ্রিস্টান জগৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচার করে আসছে মূলত তারাই এ ধরনের অপরাধে সম্পূর্ণভাবে অপরাধী। যেহেতু প্রথম থেকেই খ্রিস্টান ধর্মাধিষ্ঠানের প্রধান ভ্যাটিকান সিটির পোপ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাদ্রিদেরকে ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাতেন এবং বিভিন্ন এলাকার খ্রিস্টান রাজাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হতো ঐ সমস্ত পাদ্রিদেরকে সহায়তা করার জন্য। সুতরাং রাজশক্তির সহায়তায় খ্রিস্টান পাদ্রিগণ কোমরে পিস্তল, হাতে বাইবেল আর পকেটে চকোলেট নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত যিশুর বাণী নিয়ে।

মানবিক মূল্যবোধের উন্নততম আদর্শ প্রতিস্থাপনের কারণে ইসলাম দ্রুত মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হয়। তরবারি কিংবা শক্তি প্রয়োগ নীতি ইসলামে কখনো ঠাঁই পায়নি। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের দুটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন দক্ষিণ নরওয়ের নৃপতি ভিকেন তার দেশে কোনো লোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ বা উদাসীনতা প্রদর্শন করলে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হতো। এভাবে সারা দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা হয়েছিল। ধর্মপ্রচার সম্পর্কে সেন্টলুই উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, 'খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে কেউ কোনো কটূক্তি বা বিরূপ সমালোচনা করলে তার প্রতিউত্তর যুক্তিতে নয়, তরবারি দ্বারা দেবে এবং তরবারিটি যতদূর যায়, সমূলে তার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিবে।'[৬] পর্তুগিজ নাবিকগণ পাদ্রিদেরকে নিয়ে শ্রীলঙ্কায় এবং ফিলিপিনসে এসে সর্বপ্রথম মুসলিম বসতিগুলো আক্রমণ করে ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

তাই খ্রিস্টান লেখকগণ ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের যেসব তত্ত্ব হাজির করেন তা ইতিহাসের পাতায় নেই এবং সেগুলো সঠিক বিচারে সত্য প্রমাণিত হয়নি। বরঞ্চ অমুসলিমগণ বিশেষ করে খ্রিস্টানগণ নিজেদের কালিমা গোপন করতে গিয়ে ইসলামের উপর মিথ্যা আরোপের চেষ্টা করেছেন। যদি মুসলমানরা অসহিষ্ণু হতেন, তা হলে স্পেনের ফার্ডিনান্ড আর ইসাবেলার মতো বর্বর নীতি গ্রহণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল অমুসলিম উৎখাত করে একক জাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত রাষ্ট্র অনেক গঠন করতে পারতেন। কিন্তু মুসলিম শাসকরা কখনো তা করেননি।

www.waytojannah.com

মুসলিম সভ্যতার বিকাশের পূর্বে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স ও স্পেন কুসংস্কার, জ্ঞানার্জনে বিমুখতা ও নানাবিধ অনাচার–পাপাচারে বিপর্যস্ত ছিল। স্পেনের ধনবান লোকেরা সর্বদা ভোগবিলাস ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় নিমগ্ন থাকত। দাসত্ব প্রথা সমগ্র ইউরোপে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মানবতার নিম্নতম অধিকারটুকুও দাসেরা ভোগ করতে পারত না। মনিবেরা এমন এক ঘৃণ্য প্রথা চালু করেছিল যে, কোনো দাস বিবাহ করলে ফুলশয্যার রাতে ভূস্বামীর অঙ্কশায়িনী হতে হতো। ঐতিহাসিক ড. আব্দুল কাদেরের ভাষায় জার্মানিতে এ প্রথাকে বিটশট ফ্লান্ডার্সে বেড–ন্যুড, ইতালিতে কার্জ্জাজিয়ো, ফ্রান্সে কুইসেজ ও ইংল্যান্ডে 'রেন্ট'[৭] বা 'নারী কর' বলা হতো। এ ধরনের হাজারো অনিয়ম অবিচারের উদাহরণ ইতিহাসের পাতা থেকে দেয়া যেতে পারে। তাই এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইসলামের বাণীকে সাধারণ মানুষ তাদের মুক্তির উপায় হিসেবে দেখেছে এবং দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। ইসলামকে বর্ধিষ্ণু ধর্ম বলা হয় কেন?

২। বিশ্বমানবতার প্রতি কোরানের আহ্বান কী?

৩। কখন মহানবী (স.) নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন?

৪। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইউরোপে দাস–দাসীদের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইসলামের দ্রুত প্রচার ও প্রসারের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।

২। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলাম বিদ্বেষী লেখকদের 'Theory of Sword' বা তরবারি তত্ত্বটির অসারতা প্রমাণ কর।

---

১. কুলু লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুফলিহুন—আল হাদিস।

২. 'ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম'—আল কোরান, আয়াত ৩:১৯।

৩. 'ফাল ইয়ুবাল্লোগুস শাহেদুল গায়েবা।'—আল হাদিস।

৪. 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'—আল কোরান, আয়াত ২:২৫৬

৫. 'উদয়ু ইলা সাবিলে রাব্বিকা বিল হিকমাতে অল মাও এজাতিল হাসানাতে অজাদেলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান'—আয়াত ১৬ : ১২৬

৬. 'দি প্রিচিং অব ইসলাম—T.W. Arnold, অনু : মোঃ সিরাজ মান্নান ও ইব্রাহীম ভূঁইয়া।

৭. মূর সভ্যতা—আব্দুল কাদের।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

'Minority' বা সংখ্যালঘু বলতে কী বুঝায়?

আমাদের অভিধানগুলোতে 'সংখ্যালঘু' এবং 'সংখ্যাগুরু' নামক দুটি শব্দ আছে। ইংরেজিতে সংখ্যালঘু বুঝাতে Minority শব্দের ব্যবহার করা হয় এবং সংখ্যাগুরু বুঝাতে Majority শব্দ ব্যবহার হয়। সাধারণত সংখ্যালঘু বলতে আমরা কোনো দেশে বসবাসকারী এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝে থাকি যারা উৎপত্তিগত (ethnic), ধর্মীয় (religion) এবং ভাষাগত (linguistic) দিক থেকে সে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক সত্তার অধিকারী।

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী Minority (noun) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'smaller group of people differing from larger in race, religion, language etc.' অর্থাৎ আভিধানিকভাবে মাইনরটি বা সংখ্যালঘু বলতে একটি ক্ষুদ্র জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত প্রভৃতি দিক থেকে বৃহত্তর জনসমষ্টি থেকে পৃথক। এ শব্দটির বিশেষণ (adjective) হচ্ছে 'minor' যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে Lesser বা Comparetively small in size or importance.

অপর পক্ষে Majority (noun) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে greater number or part. Majority should strictly be used of a number of people or things, as in the majority of people and not of a quantity of something as in the majority of work. অর্থাৎ মেজরিটি বলতে বৃহৎ সংখ্যক বা অংশ বুঝায় এবং এ শব্দটি জনসংখ্যা বুঝাতে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়।

এ শব্দ দুটো স্থানভেদে আবার তাদের প্রকৃতি পরিবর্তন করে। যেমন—কোনো দেশে যে জনগোষ্ঠী Majority বা সংখ্যাগুরু সে জনগোষ্ঠী অন্যদেশে সংখ্যালঘু হতে পারে; আবার অনুরূপভাবে যে জনগোষ্ঠী একদেশে সংখ্যালঘু বা minority অন্যদেশে সে জনগোষ্ঠী আবার সংখ্যাগুরু হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। যেমন—বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু আর মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। বিপরীতক্রমে ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু আর হিন্দুরা সংখ্যাগুরু। এ ধরনের আরো অনেক দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন—খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশে সংখ্যালঘু কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশসমূহ ও অন্যান্য দেশে তারা সংখ্যাগুরু বা Majority. আবার একটি দেশে অনেক ধরনের সংখ্যালঘু থাকতে পারে। যেমন—শ্রীলঙ্কাতে

www.waytojannah.com

মুসলিমরা সংখ্যালঘু, অনুরূপভাবে তামিলরাও সেখানে সংখ্যালঘু। আবার বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং উপজাতিরা সংখ্যালঘু বা Minority শুধুমাত্র মুসলমানরা সংখ্যাগুরু বা Majority. সমগ্র বিশ্বে একশটির মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ বিদ্যমান থাকলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু জনসমষ্টি হিসেবে বসবাস করছে।

জাতিসংঘ (United Nations) তাদের চার্টারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের একটি সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। জাতিসংঘের মতে সংখ্যালঘু বা Minority বলতে বুঝায়, 'A group of Citizens of a state endeavored with ethnic, religious or linguistic characteristis which differ from the majority of the population, having a sense of solidarity with one another, motivted if only implicitly by a collective will to survive and whose aim is to achive equality with the Minority in fact and in law.' অর্থাৎ সংখ্যালঘু বা Minority বলতে বুঝায়, একটি দেশের এমন একটি নাগরিকের সমষ্টি যারা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত দিক থেকে সে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক সত্তার অধিকারী এবং তারা একে অপরের সাথে একাত্মতা অনুভব করে এবং যৌথভাবে তারা নিজেদেরকে রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত, যার লক্ষ্য হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতো কার্যত এবং আইনত সমঅধিকার লাভ করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। যেমন—

(১) এরা বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা।
(২) এরা উৎপত্তিগত, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক।
(৩) এ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ ঐকতান বিদ্যমান।
(৪) এরা নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষায় সদা তৎপর।
(৫) এরা কার্যত আইনত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মতো সমঅধিকারের দাবিদার।

তাই বলা যায়, যেসব দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর যেসব দেশে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু সব দেশে মুসলমানদের মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান এবং তারাও সংখ্যাগুরুদের মতো সমঅধিকার পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘুদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা হয় না অথবা প্রদান করা হয় না। যা জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সনদের লঙ্ঘন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। 'সংখ্যালঘু' এবং 'সংখ্যাগুরু' বলতে কী বুঝ?
২। জাতিসংঘের চার্টার অনুযায়ী সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'সংখ্যালঘু' বলতে কী বুঝ? সংখ্যালঘু জাতি-গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

www.waytojannah.com

তৃতীয় অধ্যায়

নেপালের মুসলিম অধিবাসী

নেপালে মুসলিমদের আগমন, প্রত্যাবাসন ও জীবনধারা

নেপাল বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রতিবেশী দেশ। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে সিলেটের দূরত্ব যতটুকু তার চেয়ে কম দূরত্বে নেপালের অবস্থান। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যের লীলাভূমি নেপালকে 'হিমালয়ের কন্যা' (Daughter of the Himaloyah) নামে আখ্যায়িত করা হয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ের মেঘ-রৌদ্রের আলো-ছায়ার লুকোচুরি, কৈলাস আর কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ, পাহাড়-পর্বত আর সবুজের সমারোহে পরিবেষ্টিত শান্ত-স্নিগ্ধ হৃদয়-হারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আবহমানকাল থেকে সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষকে আকৃষ্ট করে আসছে। তাই নেপাল পরিণত হয়েছে পর্যটকদের স্বর্গরাজ্যে। নেপাল প্রায় বাংলাদেশের সমআয়তনের একটি দেশ। এর আয়তন হচ্ছে ৫৪,৬০০ বর্গমাইল। এর দক্ষিণে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলো হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাঞ্চল প্রদেশ আর উত্তরে চীন। পূর্বদিকে সিকিম আর পশ্চিম-পশ্চিম উত্তরে উত্তরাঞ্চল প্রদেশ ও চীন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডোর (যাকে সাধারণত Chickenneck করিডোর বলা হয়) বাংলাদেশকে নেপাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বাংলাদেশ থেকে নেপাল যেতে হলে লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী চেকপোস্ট দিয়ে অপর পাড়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চ্যাংড়াবান্ধা চেকপোস্ট দিয়ে শিলিগুড়ি যেতে হবে। শিলিগুড়ি থেকে নেপালের উদ্দেশে ট্যাক্সি-বাস প্রভৃতি যানবাহন রয়েছে। নেপাল হিন্দু সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত একটি দেশ এবং পৃথিবীর মধ্যে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হলেও নেপালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম অধিবাসী ও নাগরিক রয়েছেন।

নেপালে মুসলমানদের আগমন : নেপালে যেসব মুসলিম অধিবাসী আছেন তারা অধিকাংশই সুন্নি মতাবলম্বী। নেপালের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এরা একটি অসংঘবদ্ধ সম্প্রদায়। এদের মধ্যে কিছু শিয়া আছে, যাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রাচীনকাল

www.waytojannah.com

থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জীবিকার প্রয়োজনে মুসলমানরা নেপালে আগমন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ভারতের সুলতানি আমলে নেপালে প্রচুর সংখ্যক মুসলমানের আগমন ঘটে। এখানকার হিন্দু রাজাগণ বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি; বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন এবং প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম তৈরির জন্য দিল্লি থেকে অনেক অভিজ্ঞ মুসলিম কারিগর সম্প্রদায়কে নেপালে নিয়ে আসেন। মূলত নেপালি মুসলিমদের পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা এবং তিব্বত থেকে নেপালে আগমন করে। চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অনেক মুসলিম নেপালে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মুসলিমদের সংখ্যা ও বাসস্থান : বর্তমানের নেপালে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা হচ্ছে ৯,৭১,০৬৫ জন, যা নেপালের মোট জনসংখ্যার ৪.২ শতাংশ মাত্র। এ জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ ভারতের উত্তর প্রদেশ এবং বিহার সংলগ্ন তিরাই অঞ্চলে বসবাস করে। বাকি তিন ভাগ রাজধানী কাঠমান্ডু ও পশ্চিমের পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে। এদের জাতিগত সম্পর্ক সূত্র বা Ethnic relation হচ্ছে ভারতীয় মুসলমান। তেরাই অঞ্চলটি ভারতের বিহার এবং উত্তর প্রদেশ সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ার কারণে নেপালের মুসলমানরা বিহার এবং উত্তর প্রদেশের মুসলিমদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

নেপালের মুসলমানদের প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন—

ক. মাধেশি মুসলমান (The Madhesi Muslims)
খ. কাশ্মিরি মুসলমান (The Kashmiri Muslims)
গ. চরাতি মুসলমান (The Chaurate Muslims)
ঘ. তিব্বতীয় মুসলমান (The Tibetean Muslims)

ইতিহাসের গতিপথের বিভিন্ন বাঁকে এরা নেপালে আগমন করে বসতি গড়ে তোলে। নিচে এদের জীবনধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

(ক) মাধেশি মুসলমান

নেপালে মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশ রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করলেও এদের ৯৭ শতাংশ তেরাই জেলার বাংকে, কপিলাবস্তু, রুপানদেহী, পার্সা, বারা এবং রতহাত এলাকা, যা হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলের ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন একটি সমতল উপত্যকা—তার মধ্যে বসবাস করে। মুসলিম শাসিত ভারত থেকে অনেক মুসলিম নেপালে আসে। এই ক্রমধারা অনুসারে উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ ভারত থেকেও মাধেশি মুসলিমগণ নেপালে আগমন করে।

জীবনধারা

মাধেশি মুসলিমগণ অধিকাংশ দিনমজুর হিসেবে জীবনযাপন করে। অনেকে আবার কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হিসেবে কৃষি কাজের সাথে জড়িত। অনেকে বর্গাদার হিসেবে কৃষি শ্রমের

www.waytojannah.com

সাথে সম্পৃক্ত। বাড়িতে তারা উর্দুতে কথা বলে এবং পশ্চিম তেরাই ও মধ্য তেরাইয়ের জনগণের সাথে আওয়াধি, ভোজপুরি, মৈথিলি প্রভৃতি ভাষায় কাজকর্ম সম্পাদন করে।

তেরাই অঞ্চলের মাধেশি মুসলিমগণ বংশীয় মর্যাদার উপর গুরুত্ব দেয়। মাধেশি হিন্দুদের মতো এদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নেই। এরা পরিবারের প্রধানকে সম্মান করে। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, উৎসব-অনুষ্ঠান এরা যৌথভাবে সম্পাদন করে। তবে আন্তঃগোত্রীয় বিবাহের ব্যাপারে এরা গোত্রীয় পরিচয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

(খ) কাশ্মিরি মুসলমান

চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতানি শাসনামলে নেপালের রাজা রাম মাল্লার শাসনকাল থেকে কাশ্মিরি মুসলমানরা নেপালে আগমন করতে থাকে। এই আগমন এবং নির্গমন বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত চলছে। ১৯৭০-এর দিকে কাশ্মিরের স্বাধীনতা সংগ্রাম অবদমনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযান পুরোদমে শুরু হলে তখন থেকে অনেক কাশ্মিরি মুসলিম স্বদেশ ত্যাগ করে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। তাই বলতে গেলে সেই সুলতানি আমল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত নেপালে কাশ্মিরি মুসলমানদের আগমন ও প্রত্যাগমন চলে আসছে। মধ্যযুগে আগমনকারী কাশ্মিরি মুসলমানগণ রাজা রাম মাল্লার দরবারে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে নিয়োজিত হয়। অনেকে আবার তিব্বতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হয়। এদের অধিকাংশ রাজধানী কাঠমান্ডুতে বসবাস করে। এরা অনেকেই সুশিক্ষিত এবং কাশ্মিরি ভাষার পরিবর্তে নেপালি এবং উর্দু ভাষায় কথা বলে। বিংশ শতাব্দীর দিকে আগত অনেক কাশ্মিরি কাঠমান্ডুতে পর্যটন এলাকায় প্রসাধন সামগ্রীর দোকানসহ সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। মধ্যযুগে আগমনকারী অনেক কাশ্মিরি সাথে নবাগত কাশ্মিরিদের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। এরা কুটিরশিল্প, কম্বল ও পশমের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্রের ব্যবসার সাথে জড়িত।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তারা ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে সচেষ্ট। ইবাদতের জন্য এরা মসজিদ এবং কাশ্মিরি ঐতিহ্য অনুযায়ী 'তাকিয়া' তৈরি করে। মসজিদ এবং 'তাকিয়া'কে অবলম্বন করে তারা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

(গ) চরাতি মুসলমান

নেপালের মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে আরেকটি গ্রুপের নাম হচ্ছে চরাতি। এরা ষোল ও সতের শতকের দিকে নেপালের পাহাড়ি অঞ্চলের হিন্দু শাসকদের আমন্ত্রণে ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে সেখানে গমন করে। এরা পাহাড়ি অঞ্চলের শাসকদের জন্য কামানসহ অন্যান্য যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করত। এদের বংশধরগণ এখনো চরাতি বা শাঁখা-চুড়ি বিক্রেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও এদের অধিকাংশ বর্তমানে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে এদের বসতি।

চরাতি মুসলমানরা পাহাড়িয়া অঞ্চলের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দ্বারা প্রভাবিত হলেও ধর্মীয় জীবনে তারা ইসলামি আচার-প্রথা অনুসরণ করে। এরা ইসলামি খৎনা প্রথা এবং মৃত

www.waytojannah.com

ব্যক্তির দাফন–কাফনে ইসলামি শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করে। বিয়ের দেনমোহর ও জাকাত আদায় করে। চরাতি মুসলিমগণ নেপালি ভাষায় কথা বলে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক–পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন রীতি–নীতিতে তারা হিন্দুদের থেকে পৃথক মুসলিম রীতি অনুসরণ করে।

(ঘ) তিব্বতীয় মুসলমান

নেপালের তিব্বতীয় মুসলমানরা প্রধানত লাদাখ এবং তিব্বতের প্রধান শহর লাসা থেকে নেপালে আগমন করে। ১৯৫৯ সালে চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের পর সেখানকার মুসলমানরা ব্যাপকহারে নেপালে অভিবাসিত হয়। অভিবাসনের পর তিব্বতীয় মুসলমানরা জীবিকার তাড়নায় বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে। এদের অনেকে পর্যটন এলাকায় চীনা পর্যটকের চাহিদা মোতাবেক পণ্য সরবরাহ ব্যবসা করে থাকে। অনেকে আবার চীনা ও তিব্বতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করে।

দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে একদল মুসলিম বণিক কাশ্মির এবং লাদাখ থেকে তিব্বতে আগমন করে। পরবর্তী সময়ে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় মহিলাদের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে একটি মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তোলে। এসব মুসলিম বণিকের দাওয়াতি কার্যক্রমের ফলে ইসলামি আদর্শের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে অসংখ্য তিব্বতীয় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর এবং চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের পর অনেক তিব্বতীয় মুসলমান বাধ্য হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তিব্বতীয় নেপালি মুসলমানরা এক অদ্ভুত সম্প্রদায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সজাগ দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত উন্নতির প্রয়াসে বেগবান একটি সম্প্রদায় হয়েও বিভিন্ন বৈরী পরিবেশ মোকাবিলা করে তারা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি অটুট রেখেছে।

নেপালি মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনধারা

উপরে উল্লিখিত চারটি সম্প্রদায়ের ইতিহাসই মূলত নেপালি মুসলিমদের ইতিহাস। এরা সবাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামি জীবনাচার ও সংস্কৃতি মেনে চলার চেষ্টা করে এবং বিবাহ, উত্তরাধিকার নিয়ম, সাদকা–জাকাত, বিভিন্ন ইসলামি উৎসব, যেমন—দুই ঈদ, রমজান, মহররম, শবেমেরাজ প্রভৃতি ইসলামি বিধি অনুযায়ী করে থাকে। নেপালি মুসলিমরা অধিকাংশ সুন্নি। তবে এখানে অতি নগণ্য সংখ্যক শিয়া রয়েছে, যারা শিয়া মতবাদ অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শিয়া সম্প্রদায় মুসলিম বিশ্বে ইসলামি ঐক্যের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায় হিসেবে বিদ্যমান। সংখ্যায় যত নগণ্যই হোক, যেখানে তারা থাকবে, সেখানে বিভাজনের একটা চিহ্ন দেখা যাবে। নেপালের কাঠমাণ্ডুতে 'থামেল' নামে একটি এলাকা আছে। এখানে একটি জামে মসজিদ আছে। যেখানে শিয়া–সুন্নি সবাই মিলে নামাজ আদায় করত। এখন শিয়ারা সেখানে শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য আরেকটি নতুন মসজিদ করেছে। এভাবে বিভাজন প্রক্রিয়া ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে।

www.waytojannah.com

নেপাল সাংবিধানিকভাবে হিন্দুরাষ্ট্র হলেও সৌভাগ্যবশত এখানে কোনো জাতিগত বা ধর্মীয় দাঙ্গা এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি বলে জানা যায়। তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে এদের উন্নয়নের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ বা সহযোগিতা সরকার পক্ষ থেকে নেয়া হয় না। অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। রাজনীতিতেও তাদের তেমন প্রভাব নেই। ছোটখাটো সমস্যা মোকাবিলা করে এরা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। নেপালের পরিচয় দাও।

২। নেপালি মুসলমানেরা কয় ভাগে বিভক্ত?

৩। নেপালি মুসলমানদের কয়েকটি উৎসবের বিবরণ দাও।

৪। নেপালি মুসলমানেরা প্রধানত নেপালের কোন অঞ্চলে বসবাস করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নেপালের মুসলমানদের আগমন ও তাদের সামগ্রিক জীবন ধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

www.waytojannah.com

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীলঙ্কায় ইসলামের আগমন মুসলমানদের বিকাশ, বর্তমান অবস্থা ও জীবন সংগ্রাম

ভূমিকা

'সিংহল দ্বীপ, সাগরের টিপ' শ্রীলঙ্কা বা সিংহল সম্পর্কে এটি হচ্ছে আমাদের বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের একটি অতি পরিচিত প্রবাদ। বস্তুত ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত ৬৫,৬১০ বর্গকিলোমিটারের এ ভূখণ্ডটি উত্তরাংশে পকপ্রণালী দ্বারা ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি দ্বীপরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। শ্রীলঙ্কা যার প্রাচীন নাম সিংহল[১]—এটি সার্কের (SAARC) অন্যতম একটি সদস্য রাষ্ট্র। শ্রীলঙ্কা মোট নয়টি প্রভিন্সে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে—

১। নর্দার্ন প্রভিন্স
২। নর্দার্ন সেন্ট্রাল প্রভিন্স
৩। নর্থ–ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স
৪। সাউদার্ন প্রভিন্স
৫। সাবারাগমুয়া প্রভিন্স
৬। উভা (UVA) প্রভিন্স
৭। সেন্ট্রাল প্রভিন্স
৮। ইস্টার্ন প্রভিন্স ও
৯। ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স

শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা ২ কোটি এবং ১০% মুসলিম। ২০১২ সালের আদমশুমারি মতে শ্রীলঙ্কার মুসলিম অধিবাসী সংখ্যা হচ্ছে ১৯,৬৭,২২৭ জন—যা প্রায় মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। শ্রীলঙ্কার মুসলমানরা তিনটি আদি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে—

১। শ্রীলঙ্কান মূর মুসলিম,
২। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম (তামিল মুসলিমসহ) এবং
৩। মালয় মুসলিম।

ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে, যেমন : বোহরা এবং খোজা সম্প্রদায় নামে অতিনগণ্যসংখ্যক শিয়া সম্প্রদায়ের সদস্য রয়েছে। শ্রীলঙ্কান মুসলমানদেরকে সাধারণত 'শ্রীলঙ্কান মুসলিম' অথবা 'শ্রীলঙ্কান মূর' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। শ্রীলঙ্কার

www.waytojannah.com

মুসলমানদের ৯৯ শতাংশ সুন্নি শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী (Sunni Shafi school of thought)। শ্রীলঙ্কার সমাজ নানা বর্ণের আদিবাসী জনগণ নিয়ে গঠিত, যাকে multi ethnic society হিসেবে অভিহিত করা যায়। তিন ধরনের আদিবাসী, যেমন : সিনহালি, তামিল এবং মুসলিম আদিসত্তা নিয়ে শ্রীলঙ্কান জনসমাজ গঠিত। এদের মধ্যে সিনহালিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রভাব বিস্তারকারী সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ হচ্ছে তামিল সম্প্রদায় এবং তৃতীয় পর্যায়ের অবস্থানে আছে মুসলিম সম্প্রদায়।

শ্রীলঙ্কায় ইসলামের আগমন : সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কায় আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে এবং আস্তে আস্তে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ভারত মহাসাগরে আরব আধিপত্য এত বৃদ্ধি পায় যে বস্তুত ভারত মহাসাগর আরব হ্রদে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক John J. Saunders-এর মতে, 'The Indian Ocean had been for centuries an Arab lake. Occasionelly, Chinese trading fleets were seen there but they seem to have disappeared after 1440.' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বন্দরের গমনাগমনের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা আরব বণিকদের ট্রানজিট পোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। শ্রীলঙ্কার পোতাশ্রয়, জাহাজ মেরামতের সুবিধা, খাবারদাবার, কেনাকাটা এবং লোকবল আরব বণিকদের নিকট সিংহলকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সাউদার্ন প্রভিন্সের গ্যালেসহ অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। অনেক আরব বণিক শ্রীলঙ্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কান নারীদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করে বিবাহের মাধ্যমে ঘর-সংসার করতে শুরু করে। মুসলিম বণিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে (unobstrusive labour of the Muslim traders) শ্রীলঙ্কায় (প্রাচীন নাম সিংহল—Cylon) ইসলাম একটি বর্ধিষ্ণু ধর্ম হিসেবে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। সিংহলের অনেক স্থানীয় রাজাও ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। সিংহলের রাজা চেরুমন পরিমলের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তার সভাসদসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। ৭১২ খ্রি. মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে সিন্ধুর জলদস্যু কর্তৃক বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠনের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই জাহাজগুলো সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে দুটি বিবরণ প্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে তা এখানে উল্লেখ করা হলো। প্রথম বিবরণটি এরূপ—শ্রীলঙ্কার সাথে প্রাচীনকাল থেকে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর এ যোগাযোগ আরো ব্যাপকতা লাভ করে এবং শ্রীলঙ্কায় অনেক মুসলিম কলোনি গড়ে ওঠে। একবার কোনো কারণে সেখানে কিছু ব্যবসায়ী মৃত্যুবরণ করলে সেখানকার রাজা বণিকদের সহায়-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে আটটি জাহাজে করে স্বদেশে প্রেরণ করার পথে সিন্ধুর দেবল বন্দরের সন্নিকটে জলদস্যু কর্তৃক জাহাজগুলো লুণ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিবরণটি হচ্ছে—সিংহলের রাজা নিজে ইসলাম গ্রহণ করে উপঢৌকনস্বরূপ আটটি জাহাজে করে বিভিন্ন মালামাল খলিফা আল-ওয়ালিদের দরবারে প্রেরণ করছিলেন। জাহাজগুলো দেবল বন্দরের নিকটে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়।

এ সমস্ত বিবরণ এটাই প্রমাণ করে যে, সপ্তম শতাব্দী এবং তারও পূর্বে আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছিল এবং স্থানীয় জনগণ ইসলাম গ্রহণ

www.waytojannah.com

করে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে। এভাবে ইসলাম শ্রীলঙ্কায় একটি প্রভাবশালী ধর্মে পরিণত হয়। তাই অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, যদি ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কায় পর্তুগিজদের আগমন না ঘটত তা হলে শ্রীলঙ্কা অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হত। বিভিন্ন মুসলিম লেখক ও ঐতিহাসিক, যেমন—ইসতাখির, ইবনে হায়কল, আল–মাকদিসি, ইবনে বতুতা প্রমুখের লেখায় শ্রীলঙ্কায় মুসলমানদের গৌরবময় উপস্থিতির বিবরণ পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ খ্রিস্টানরা শ্রীলঙ্কায় উপস্থিত হয়। ক্রুসীয় উন্মাদনা নিয়ে শ্রীলঙ্কায় এসে উপকূলীয় এলাকায় সমৃদ্ধিশালী মুসলিম জনপদ দেখে তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম জনপদগুলো আক্রমণ করে তছনছ করা শুরু করে। খ্রিস্টান পাদ্রিরা হাতে বাইবেল, কোমরে পিস্তল আর পকেটে চকোলেট–বিস্কুট নিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে যিশুখ্রিস্টের বাণী প্রচার করা শুরু করে। তাদের এই আহ্বান শ্রীলঙ্কার ধর্মীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম না হলেও মুসলমান ও ইসলামের অগ্রগতি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। পর্তুগিজদের নির্যাতনে অনেক মুসলিম পরিবার বাস্তুচ্যুত এবং সহায়–সম্পদ হারিয়ে দৈন্যদশায় নিপতিত হয়। সে সময়ে সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং ইস্টার্ন প্রভিন্সের রাজা কিং সেনারাত (King Senarat) মুসলমানদেরকে ক্যান্ডিতে আশ্রয় দেন। মুসলমানরা King Senarat–এর পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। King Senarat মুসলিমদের পুনর্বাসনের জন্য Kandy–তে অনেক ভূমি বরাদ্দ দেন। মুসলমানদের মানবতাবোধ, সৎ জীবনযাপন এবং ধর্মীয় উদারতা সে সময়ের শ্রীলঙ্কার অনেক স্থানীয় রাজাদের মুগ্ধ করেছিল। যার কারণে তারা প্রথম থেকেই মুসলমানদের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল।

খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক ও পাদ্রিরা যেখানে গিয়েছে সেখানেই তারা মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণকে উসকে দেয়ার অপচেষ্টা করেছে। ডাচরা ১৭০০ শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কায় আগমন করে। তবে ডাচগণ পর্তুগিজদের মতো ইসলামবিদ্বেষী ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্যবসা–বাণিজ্যের উপর আধিপত্য সৃষ্টি করা। বিভিন্ন শর্তে তারা মুসলমানদেরকে বাণিজ্যিক সুবিধা দেয়। মুসলমানরাও এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। শ্রীলঙ্কার পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাট্টিকালো থেকে কলম্বো এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে জাফনা থেকে গ্যালে পর্যন্ত মুসলমানরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় মুসলমানরা শ্রীলঙ্কাতে ইউনানি ওষুধের প্রচলন ঘটায় এবং তারা এ বিষয়ে উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। কথিত আছে যে, ক্যান্ডির এক রানীকে ইউনানি চিকিৎসার মাধ্যমে একজন মুসলিম চিকিৎসক সুস্থ করে তোলেন। এতে ক্যান্ডির রাজদরবারে মুসলমানদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়।

শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের সাথে সিনহালিদের সংঘর্ষ : বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা : পৃথিবীর সব দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের চাপের মুখে থাকে। সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ হলো আইনের শাসন এবং শাসক শ্রেণীর উদার দৃষ্টিভঙ্গি। একটি দেশ ও জাতির

www.waytojannah.com

উন্নয়নে সংখ্যাগরিষ্ঠদের যেমন ভূমিকা থাকে, সংখ্যালঘিষ্ঠরাও তেমনি অবদান রাখে। যেমন— শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতি গঠনে মুসলিমরা প্রভূত অবদান রেখেছিল এবং বর্তমানেও রাখছে। ডাচ এবং পর্তুগিজদের সময়কালে সিনহালিরা মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেছিল। এভাবে সিনহালি এবং মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্যের একটি সেতুবন্ধ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তী পর্যায়ে সিনহালিগণ বিভিন্ন অজুহাতে মুসলমানদের উপর খড়গহস্ত হতে শুরু করে। মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক প্রভাব এবং ব্যক্তি প্রভাব হয়তো বা সিনহালিদের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত করে থাকতে পারে। সিংহলি মুসলমানদের উপরে উল্লেখযোগ্য যে বিপর্যয়গুলো বিভিন্ন সময়ে নেমে এসেছিল তার মধ্যে তিনটি হচ্ছে মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় আর একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। নিচে এ বিপর্যয়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো—

ক. মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় :

১. সিনহালি–মুসলিম রায়ট—১৯১৫
২. নর্দার্ন প্রভিন্স থেকে এলটিটিই কর্তৃক মুসলিম উচ্ছেদ—১৯৯০
৩. উগ্রবাদী বৌদ্ধ নেতা বধুবালা কর্তৃক মুসলিম নিধন—২০১৩

খ. প্রাকৃতিক বিপর্যয় :

১. সুনামির আঘাতে লণ্ডভণ্ড মুসলিম জনপদ—২০০৪

ক. মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়

১. সিনহালি-মুসলিম রায়ট-১৯১৫ : ১৯১৫ সালে সংঘটিত সিনহালি–মুসলিম রায়ট শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের মনে একটি অমোচনীয় ক্ষত সৃষ্টি করেছে। উভা (UVA) প্রভিন্সের গামপোলাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করাকে কেন্দ্র করে এ সহিংসতা শুরু হয়। শ্রীলঙ্কায় তখন ব্রিটিশ শাসন চলছিল। যদিও ১৯১৫ সালে এ দাঙ্গা সংঘটিত হয় কিন্তু এর বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। মুসলমানরা গামপোলাতে একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলে সিনহালি বৌদ্ধগণ এতে বাধা দেয়। তাদের যুক্তি হলো যেহেতু মসজিদটি বৌদ্ধদের 'পেরাহেরা' ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় মিছিলের পথে অবস্থিত, সুতরাং এখানে তা নির্মাণ করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালতে গড়ায়। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিমদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীলঙ্কার সুপ্রিমকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করে মসজিদ নির্মাণের পক্ষে রায় দেয়। এতে সিনহালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ক্যান্ডিতে বৌদ্ধদের 'ভেসাক পেরাহেরা' মিছিল যখন রাস্তা অতিক্রম করছিল তখন কয়েকজন মুসলিম তা দেখছিল। এক পর্যায়ে তাদের কোনো এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সিনহালিরা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে মুসলমানদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর, মসজিদ–মাদ্রাসা, খানকাহ সর্বত্র লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা–ধর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্রিটিশ সরকারের কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতায় মুসলমানরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা ঘুরে দাঁড়ায় এবং তাদের স্বতন্ত্র পরিচিতি রক্ষা করে টিকে থাকতে

www.waytojannah.com

সক্ষম হয়। হত্যা হত্যাই আর ধ্বংস ধ্বংসই। যে কোনো অভিধানের ধ্বংস সম্পর্কিত সকল শব্দ ব্যবহার করেও এর প্রকৃত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। ১৯১৫ সালের এই দাঙ্গা শ্রীলঙ্কার মুসলিম গণ-মানসে এক বিভীষিকাময় দগদগে ক্ষত হয়ে আছে।

২. শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ : নর্দার্ন প্রভিন্স থেকে এলটিটিই কর্তৃক মুসলিম উচ্ছেদ-১৯৯০ : ১৯৮৩ সাল থেকে শ্রীলঙ্কার সংখ্যালঘু তামিলগণ শ্রীলঙ্কাকে বিভক্ত করে নর্দার্ন প্রভিন্স এবং ইস্টার্ন প্রভিন্সের কিছু এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে এবং এলটিটিই অর্থাৎ Liberation Tigers of Tamil Elam নামে একটি সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে তোলে। এটা ছিল সিনহালিদের বিরুদ্ধে তামিলদের সশস্ত্র সংগ্রাম। মুসলমানরা এতে কোনো পক্ষই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই তারা মুসলমানদেরকে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। Ethnic cleansing বা জাতিগত উচ্ছেদের মাধ্যমে তারা মুসলমানদেরকে জাফনা থেকে বিতাড়ন করার মাধ্যমে একটি একক তামিল জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন পোষণ করে। সশস্ত্র এলটিটিইর গুণ্ডারা মুসলিম বসতির উপর চড়া হতে শুরু করে এবং হত্যা-ধর্ষণ ও জ্বালাও-পোড়াও আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং ৪৮ ঘণ্টার নোটিশের মাধ্যমে তারা জাফনা থেকে সকল মুসলমানকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আদেশ পালনে ব্যর্থদের পাইকারি হত্যার ঘোষণা প্রচার করে। বাধ্য হয়ে মুসলমানরা তাদের সব সহায়-সম্পদ রেখে উদ্বাস্তু হয়ে অন্য প্রদেশের দিকে রওনা দেয়। এভাবে ৯৫,০০০ মুসলমান বাস্তুচ্যুত হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।

শেষ পর্যন্ত তামিলদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দীর্ঘ ২৬ বছরের তামিলদের সশস্ত্র বিদ্রোহ শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় সরকার দমন করতে সমর্থ হয়েছে এবং শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষিত হয়েছে। এলটিটিই সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। মানবতা বিরোধী নিরীহ জনসাধারণকে হত্যাকারী এসব সশস্ত্র গ্রুপের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—এতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও এলটিটিইর প্রধান ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ উত্তরাঞ্চল থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার ও নির্যাতনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০২ সালে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তবুও এ নির্যাতন ও বহিষ্কার শ্রীলঙ্কান মুসলমানদের অন্তরে এমন এক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, যার রক্তক্ষরণ সুদীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকবে। অনেকে তার এ ক্ষমা প্রার্থনাকে 'গরু মেরে জুতা দান' প্রবাদের সাথে তুলনা করেছেন। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর কিছু সংখ্যক তামিল মুসলিম আবার জাফনাতে ফিরতে শুরু করেছেন। তারা সেখানে ওসমানিয়া কলেজ পুনরায় চালুর পাশাপাশি দুটি মসজিদ চালু করেছে। ১০টি মুসলিম দোকানে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মুসলমানদের পুরোদমে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। একটি দেশের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক সে দেশেরই আরেকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এরকম নির্যাতন ও নিধন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। শ্রীলঙ্কায় তামিলদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে হয়তো-বা এটা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন তথ্যানুসারে জানা যায় যে, মুসলমানদের বহিষ্কারের প্রাক্কালে জাফনাতে/উত্তর প্রভিন্সে ১২৮টি মসজিদ, ২৬টি দরগাহ, ১৩৯টি মাদ্রাসা, সরকার পরিচালিত ৬৫টি মুসলিম স্কুল, ১৩৯৭৮ একর ধানক্ষেত, ১৮৯০৭ একর নারকেল বাগান এবং ২৩৯৫টি বিভিন্ন ধরনের

www.waytojannah.com

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল মুসলমানরা। এ সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি মুসলমানরা ফেরত পাবে কি না তাও এখন অনিশ্চিত। এটা যেন সন্ত্রাসীদের দ্বারা বসনিয়ার মুসলমানদের জাতিগত উচ্ছেদ ও নিধনের মতো। রুবায়েজ হানিফার মতে, 'This is a rare example of oppression of a minority by a minority.'

৩. উগ্রবাদী সন্ত্রাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু বধুবালা কর্তৃক ২০১৩ সালে মুসলিমবিরোধী অপপ্রচার ও মুসলিম নিধন : ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মুসলমানরা এই বিশেষ জীবন বিধানের আলোকে তাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। খাবারদাবারের ক্ষেত্রেও রয়েছে তাদের বিশেষ নিয়মনীতি। তারা হালাল খাবার গ্রহণ করে ও হারাম খাবার পরিহার করে চলে। এজন্য পশু–পাখির মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা তাদের ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলে। এমনকি পশু–পাখি জবাই করার ক্ষেত্রেও ইসলামের নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যদি কোনো হালাল পশু–পাখি আল্লার নামে জবাই করা না হয় তা হলে হালাল পশু বা পাখি হলেও তা মুসলমানের জন্য হারাম হয়ে যাবে। এজন্য মুসলমানরা খাবার–দাবারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সচেতন থাকে। শ্রীলঙ্কার মুসলমানরা যেহেতু ইসলামি জীবনবোধে বিশ্বাসী তাই তারা অবশ্যই হালাল মাংস, হালাল খাবার ইত্যাদি গ্রহণ করবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীলঙ্কার এক উগ্র বৌদ্ধ ভিক্ষু যার নাম বধুবালা সে মুসলমানদের এই হালাল মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। ২০১৩ সালে সে তার দলে কিছু উগ্রবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জড়ো করে এবং মুসলমানরা কেন বৌদ্ধদের জবাই করা মাংস খাবে না তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। একপর্যায়ে সে ও তার অনুসারীরা মুসলমানদের মসজিদ, দোকান, বাসগৃহ ও অন্যান্য স্থাপনায় হামলা করতে শুরু করে। এতে মুসলমানদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয় এবং কিছু মুসলমান নিহত হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং মুসলমানরা প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়। সংক্ষেপে উপরিউক্ত ঘটনাগুলো হচ্ছে শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের জন্য মনুষ্যসৃষ্ট ট্র্যাজেডি, যার মোকাবেলা করে মুসলমানেরা টিকে আছে।

খ. প্রাকৃতিক বিপর্যয়

১. সুনামির আঘাতে লণ্ডভণ্ড মুসলিম জনপদ-২০০৪

শ্রীলঙ্কার মুসলমানেরা জাতিগত দাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুনামির আঘাতে মুসলিম জনপদগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভোরের দিকে কোনোকিছু বোঝার আগেই অকস্মাৎ সুনামি শ্রীলঙ্কার উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর উপকূলীয় জনপদে তীব্র আঘাত হানে। তাৎক্ষণিক হিসাব মতে এ আঘাতের ফলে ৩০,০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং ৮,০০,০০০ লোক গৃহহীন হয় এবং ২,০০,০০০ পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তবে প্রকৃত সংখ্যা কখনো জানা যাবে না এবং এ ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত বিবরণও উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না।

আগেই বলা হয়েছে যে, মুসলিমগণ সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সপ্তম শতাব্দী থেকে তাদের লোকালয় গড়ে তুলেছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই সুনামির আঘাতে মুসলিম

www.waytojannah.com

পরিবারগুলো অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা ছিল তাদের জন্য 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'–এর সমতুল্য। সুনামির পরপরই সারা জাতি বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা মুসলিম মৃতদেহগুলো ইসলামি রীতি অনুযায়ী দাফন–কাফনের ব্যবস্থা করে এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও এ মানবিক বিপর্যয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে ও কর্মকাণ্ডে ফিরে আসতে সাহায্য করে। সুনামির এই বিপর্যয়কারী আঘাত মুসলিমদের স্মৃতিতে চিরজাগরূক হয়ে থাকবে।

বর্তমান অবস্থা

শ্রীলঙ্কার মুসলমানরা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং একটি সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক হিসেবে নিজেদের স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষা করে শ্রীলঙ্কায় বসবাস করে আসছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের ঈর্ষণীয় উন্নতি লক্ষণীয়। শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন সরকার সরকারি সহায়তায় মুসলিম শিশুদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল পরিচালনা করে থাকে এবং প্রতিটি স্কুলে ইসলামি মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার জন্য হেড মৌলবি নিয়োগ দেয়া হয়। শ্রীলঙ্কার মুসলিম ছাত্রগণ জাতীয় কোটায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তির সুযোগ পায়। তারা সিনহালি, তামিল অথবা ইংরেজি যে কোনো একটি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অন্য কারো ক্ষেত্রে এ সুযোগ প্রদান করা হয় না। পেশাগত দক্ষতার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অগ্রগতি লক্ষণীয়। যার কারণে দক্ষ পেশাজীবী জনশক্তি নিয়োগে মুসলমানগণ উল্লেখযোগ্য হারে সুবিধা পাচ্ছে। ১৯৭০–৭৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে মুসলমানদের হজব্রত পালনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে বিশেষ ছাড় দেয়া হয়। ১৯৮০ সাল হচ্ছে শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বছর বা land-mark year. এ বছর শ্রীলঙ্কার জে. আর. জয়বর্ধনের সরকার মুসলমানদের মসজিদ, ঈদগাহ, পবিত্র দরগাহ ও স্থানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য Department of Muslim Religious and Cultural Affairs নামে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করে। এই মন্ত্রণালয় উল্লিখিত বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধান করে আসছে।

শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়েও মুসলমানরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৮৮৯ সাল থেকে আইনসভায় একজন মুসলিম প্রতিনিধি রাখা হতো, যদিও একজন প্রতিনিধি পর্যাপ্ত ছিল না তবুও ব্রিটিশরা মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাদেরকে নিয়োগ দিতেন। শ্রীলঙ্কায় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠনও রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন সংগঠন হচ্ছে Moors Union (১৯০০)। এটি পরবর্তী পর্যায়ে ১৯২২ সালে Ceylon Moors Association এবং ১৯২৪ সালে এটি আবার নাম পরিবর্তন করে All Ceylon Muslim league নাম ধারণ করে। ACML এখনো শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শ্রীলঙ্কার মুসলিম নেতৃবৃন্দ পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, 'We the minorities do not want equal representation with the Sinhalees, what we want is adequet representation and good government. I prefer this country to be ruled by the Sinhalees.' (Sir Mohammad Macan—Muslim Leader)

www.waytojannah.com

শ্রীলঙ্কায় আরো আঞ্চলিক দল আছে। জাতিগত দাঙ্গার পর থেকে মুসলিমরা এ ধরনের সংগঠন গড়ে তুলছে। তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চল প্রদেশের SriLankan Muslim Congress অন্যতম। শ্রীলঙ্কার প্রতিটি মুসলিম সংগঠনই মুসলমানদের ঐক্য সুদৃঢ়করণ, বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ এবং মুসলিমদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সুশাসনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

শ্রীলঙ্কার মুসলমানদেরকে দুধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই চ্যালেঞ্জ অব্যাহত থাকবে।

১. মুসলিম সম্প্রদায়ের অভ্যন্তর থেকে চ্যালেঞ্জ।

২. সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বহিরাগত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবিলা করা।

১. একটি সম্প্রদায়/জাতির অভ্যন্তরীণ শক্তি হলো তার যুব সম্প্রদায়। এই যুবক–যুবতীদেরকে ইসলামি জ্ঞান ও ঐতিহ্যের ধারক–বাহক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে মুসলিম হিসেবে তাদের পরিচিতি নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

২. বহিরাগত আগ্রাসন : সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায়ও বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসনের শিকার এবং আগ্রাসন বিশ্বব্যাপী চলছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ মুসলিম সমাজকে আশাহত করে ফেলছে। মুসলিম সম্প্রদায় এ ধরনের সমস্যা যুগে যুগে মোকাবেলা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে। তবে জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। শ্রীলঙ্কার মুসলিম সমাজ শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে এসব আগ্রাসনকে প্রতিরোধে সক্ষম হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। শ্রীলঙ্কার পরিচয় দাও।
২। শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন প্রদেশগুলোর নাম লিখ।
৩। শ্রীলঙ্কার মুসলিম আদি জনগোষ্ঠীর পরিচয় দাও।
৪। শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের প্রতি পর্তুগিজদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শ্রীলঙ্কায় মুসলমানদের আগমনের প্রাথমিক ইতিহাস বর্ণনা কর।
২। শ্রীলঙ্কায় মুসলমানগণ যে সমস্ত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, তার একটি ইতিহাস নির্ভর বিবরণ দাও।
৩। শ্রীলঙ্কায় মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি লেখচিত্র তৈরি কর।

---

১. ইংরেজিতে সিলন (Ceylon) ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা লাভ করে এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাকো বন্দরনায়েকের সময় ১৯৭২ সালে সিলন নাম পরিবর্তন করে শ্রীলঙ্কা রাখা হয়।

www.waytojannah.com

পঞ্চম অধ্যায়

ফিলিপাইনের মুসলিম সম্প্রদায় আগমন, বিকাশধারা ও বর্তমান অবস্থা

ফিলিপাইন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খ্রিস্টান অধ্যুষিত একটি দেশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১২৭৫ খ্রি.) এখানে আরব বণিক এবং মুসলিম মিশনারিদের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। এখানে মুসলমানদের বর্তমান জনসংখ্যা হচ্ছে ৪৩,৯৩,০৬০ জন, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ। ৯১% হচ্ছে খ্রিস্টান, মালয় ১.৫%, চীনা এবং অন্যান্য ৩%। ফিলিপাইনের দক্ষিণাংশ যা মিন্দানাও এবং মিন্দানাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সুলু দ্বীপপুঞ্জে (The Sulu Achipelago) মূলত মুসলিমদের বসবাস। এই অঞ্চলগুলোকে Autonomus Region Muslim (ARM) বা স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম অঞ্চল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো মূলত কতগুলো দ্বীপপুঞ্জের সমাহার। এই দ্বীপপুঞ্জগুলো হচ্ছে—

(১) লানাও ডেল নরটি (Lanao del Norte)
(২) লানাও ডেল সুর (Lanao del Sur)
(৩) কোটাবাটো (Cotabato)
(৪) মাগিনদানাও (Maguindanao)
(৫) সুলতান কুদরাত (Sultan Kudrat)
(৬) বাসিলিয়ান (Basilian)
(৭) সুলু (Sulu)
(৮) তাবি-তাবি (Tawi-tawi)
(৯) জুলু (Jolo)

উপরে উল্লিখিত এই দ্বীপগুলোকে দুটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়। ক্রমিক নং ০১ থেকে ০৫ পর্যন্ত দ্বীপগুলো 'মিন্দানাও'-এর অন্তর্গত এবং ০৬ থেকে ০৯ পর্যন্ত দ্বীপগুলো সুলু দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। ফিলিপাইনের মুসলিমগণ চার গোত্রে বিভক্ত। এদেরকে যৌথভাবে

www.waytojannah.com

'মরো মুসলিম' নামে অভিহিত করা হয়। এ চারটি গোত্র হচ্ছে—(১) তাউসাগ (Tausug), (২) মারানাও–ইলানুন (Maranao-Ilanun), (৩) মাগিনদানাও (Maguindanao) এবং (৪) সামাল গোত্র (Samal group).

'মরো' (Moro) নামকরণ : আটশত বছর ধরে আরব নেতৃত্বে আফ্রিকান মুসলমানরা স্পেন শাসন করে আসছিল। এসব আফ্রিকান মুসলমানকে স্পেনীয়রা 'মূর' নামে অভিহিত করত। মুসলমানদের গোত্রীয় বিবাদ ও অন্তঃকলহের কারণে মুসলিম শক্তি স্পেনে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত রাজা বর্মি ও রানী ইসাবেলার যৌথ নেতৃত্বে খ্রিস্টানরা ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের স্পেন থেকে বহিষ্কার করতে সক্ষম হয়। স্পেন থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার এবং মুসলিম শক্তির পতন সমগ্র ইউরোপে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং খ্রিস্টান জগৎ ক্রুসেডীয় উন্মাদনার জোয়ারে ভাসতে থাকে। সাফল্যের আতিশয্যে স্পেনীয় আর্মাডা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে নৌপথে অভিযান শুরু করে। এ অভিযানের এক পর্যায়ে ষোড়শ শতকে তারা ফিলিপাইনে এসে পৌছায়। ফিলিপাইনে পৌছে তারা মুসলিম অধ্যুষিত কিছু অঞ্চল দেখতে পায়। তখন এসব স্পেনীয় খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে স্পেনের 'মূর' মুসলিমদের অনুকরণে 'মরো' নামে ডাকতে শুরু করে। প্রথম দিকে ফিলিপাইনের মুসলমানরা 'মরো' নামটিকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা নিজেদেরকে 'মুসলিম' নামে অভিহিত হতে পছন্দ করত। ১৫৭০ খ্রি. থেকে মূর মুসলমানরা স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পর্যায়ক্রমে এ প্রতিরোধ সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে ফিলিপাইনের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মরো মুসলিমদের সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যাপকতা লাভ করে এবং তাদের সংগ্রামের বীরত্বগাথা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তখন 'মরো' শব্দটি শৌর্য–বীর্যের একটি প্রতীক হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হতে শুরু করে। তাই এখন ফিলিপাইনের মুসলমানরা নিজেদেরকে 'মরো' নামে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বরঞ্চ 'মরো' নামের পরিচিতিতে তারা গর্ববোধ করে।

ফিলিপাইনে ইসলামের আগমন : ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ ১২৭৫ খ্রি. ফিলিপাইন আর্কিপিলাগের মিন্দানাও এবং সুলু দ্বীপসমূহে মুসলিম বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। এজন্য ঐতিহাসিক Havell যথার্থই বলেছেন, '...The spred of Islam in India and other part of the world was unobstrusive labour of the preacher and trader who have carreid their faith into the every corner of the globe.' অর্থাৎ ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ছিল ঐ সমস্ত ধর্ম প্রচারক ও বণিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল তারা পৃথিবীর যে প্রান্তে পৌছেছেন সেখানে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সাথে নিয়ে গিয়েছেন। একই কথার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই ঐতিহাসিক John J. Saunder's সম্পাদিত 'The Muslim world on the eve of Europe's Expansion' নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন, 'Arab merchants had turned Malacca into a big international entrepot, and these same traders were earrying the faith of Islam into Malaya, Indonesia and the Philippines.' অর্থাৎ

www.waytojannah.com

আরব বণিকগণ মালাক্কাকে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক বন্দরে রূপান্তরিত করেছিল এবং এই বণিকরাই মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। এভাবে বণিক মুবাল্লিগদের (missionaries) প্রচেষ্টায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে।

১৩৮০ খ্রি. করিমুল মাখদুম নামক এক সুফি মুবাল্লিগ (Sufi missionarie) তার একদল অনুসারীসহ ফিলিপিনো দ্বীপপুঞ্জে আগমন করেন। তিনি জুলু দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী সিমুনুল দ্বীপে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করে ইবাদত–বন্দেগি করা শুরু করেন। তার আগমনের খবর পেয়ে দলে দলে লোকজন সমবেত হতে শুরু করে এবং তার হাতে বাইয়্যাত নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। ফিলিপিনো দ্বীপপুঞ্জের জুলু দ্বীপের তাউসাগ (Tausug) গোষ্ঠী সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ১৪৫০ খ্রি. সাইয়েদ আবু বকর নামে একজন সৌদি আরবের নাগরিক ফিলিপিনো দ্বীপপুঞ্জে আগমন করেন এবং জুলু দ্বীপে ইসলামি সালতানাত কায়েম করেন। তার রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তার রাজ্য 'সুলুক সাম্রাজ্য' নামে অভিহিত হতে থাকে। 'সুলুক সাম্রাজ্য' ফিলিপিনোর নিম্নাঞ্চলীয় মানুষের কাছে 'দারুল ইসলাম' (The abode of Islam) নামে সমাদৃত হতে থাকে। সুলুক সালতানাত নিকটবর্তী ব্রুনাইয়ের মালয়েশিয়ার সুলতানদের সাথে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলত এবং রাজকীয় সুলু পরিবার ও ব্রুনাইয়ের সুলতানগণ ছিলেন পরস্পর আত্মীয়।

ফিলিপিনো দ্বীপপুঞ্জে খ্রিস্টানদের আগমন ও ধর্মযুদ্ধের (crusade) শুরু : ১৪৯২ খ্রি. গ্রানাডা থেকে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কারের তিন দশক পর ১৫২১ খ্রি. স্পেনীয় আর্মাডা ক্রুসেডের উদ্দীপনা নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত করার লক্ষ্যে লিসবন থেকে রওনা দিয়ে সেনেগাল–মালি অতিক্রম করে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সাফাল এবং মাদাগাস্কার মধ্য দিয়ে জাঞ্জিবারে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে তারা ফিলিপিনো দ্বীপপুঞ্জে এসে উপস্থিত হয়। তিনশত বছর ধরে স্পেন থেকে মুর মুসলমানদের বিতাড়ন করতে গিয়ে যে দীর্ঘ সংগ্রাম তাদের করতে হয় তাতে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ জন্ম নেয়। সে ঘৃণা এবং ক্রোধ নিয়ে তারা ফিলিপাইনে উপস্থিত হয় এবং মুসলিম সালতানাত দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম সালতানাত আক্রমণ করা শুরু করে। শুরু হয়ে যায় খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ক্রুসেড আর ফিলিপিনো মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিরোধ—যা তাদের ভাষায় পারাঙ সাবিল (Parrang Sabil) বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে যুদ্ধ।

১৫৭০ খ্রি. স্পেনীয়গণ রাজা সুলায়মান শাসিত ম্যানিলার জনপদ ধ্বংস করতে সক্ষম হয় এবং এর পরে তারা ম্যানিলার নিকটবর্তী একটি মুসলিম প্রদেশও ধ্বংস করে। স্পেনীয় খ্রিস্টানগণ মুসলিমদের শক্ত ঘাঁটি মিন্দানাও এবং জুলু দ্বীপপুঞ্জ দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায় এবং প্রতিবারই তারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এভাবে তিনশত বছর ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে সফল না হয়ে তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয় এবং ১৮৯৮ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ফিলিপাইনে তাদের বিজিত এলাকাগুলো আমেরিকার নিকট হস্তান্তর করে ১৮৯৯ সালে ফিলিপাইন ত্যাগ করে। শুরু হয় খ্রিস্টান–মুসলিম সংঘর্ষের নতুন অধ্যায়।

www.waytojannah.com

আমেরিকার আগমন ও খ্রিস্টান-মুসলিম সংঘর্ষের দ্বিতীয় অধ্যায় : স্পেনীয়দের কাছ থেকে মালিকানা স্বত্ব লাভ করে আমেরিকানরা ১৮৯৯ সালে ফিলিপাইনে পৌঁছে। এখানে এসে তারা সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম সালতানাত জুলু দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে। মরো মুসলিমরা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যে প্রতিরোধ আমেরিকানদের পক্ষে ভাঙা কখনো সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে পেনসিলভানিয়ার টেম্পর ইউনিভার্সিটির গবেষক অধ্যাপক Renato Oliveros বলেন, 'The American-Moro wars in Sulu archipelago are legendary.' অর্থাৎ আমেরিকান এবং মরো মুসলিমদের মধ্যে সুলু দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধগুলো ছিল এক একটি উপাখ্যান। মরো মুসলিমদের প্রতিরোধ যুদ্ধের বীরত্ব, সাহসিকতা, ইমানি উদ্দীপনা ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে। আমেরিকানরা সামরিক শক্তিতে ছিল বলীয়ান। ১৮৯৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। তাদের আক্রমণে ক্রমে ক্রমে মুসলিম সালতানাতগুলো দুর্বল হতে থাকে। আমেরিকানরা পরবর্তীতে ফিলিপাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করার লক্ষ্যে কমনওয়েলথ স্টেটের মর্যাদা দেয় এবং ১৯৪৬ সালে ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়ে তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। যাওয়ার প্রাক্কালে তারা সুলু দ্বীপপুঞ্জকে ফিলিপিনোদের নিকট হস্তান্তর করে যায়।

আমেরিকানদের প্রত্যাগমন ও খ্রিস্টান-মুসলিম সংঘর্ষের তৃতীয় অধ্যায় : ফিলিপিনো দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয়দের আগমন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সালতানাতসমূহের উপর আক্রমণ ফিলিপিনোদেরকে স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। মরো মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিলিপিনো খ্রিস্টানদের মনে তারা ক্রোধ এবং হিংসা–বিদ্বেষের যে গ্লানি প্রজ্বলিত করে দিয়ে গিয়েছিল এবং আমেরিকান ও স্পেনীয়রা ফিলিপিনো খ্রিস্টানদের যেসব অস্ত্রশস্ত্র ও লজিস্টিক সাপোর্ট তারা দিয়ে গিয়েছিল তাতে শক্তিশালী হয়ে খ্রিস্টানগণ মরো মুসলিমদের উপর আগ্রাসী তৎপরতা চালিয়ে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা শুরু করে। তারা মুসলিম বসতির উপর আক্রমণ, নারী–শিশু–বৃদ্ধদেরকে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের মাধ্যমে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরিস্থিতির মোকাবেলায় মরো মুসলিমরাও সংঘবদ্ধ হয় এবং সশস্ত্র সংগ্রামী সংগঠন তৈরি করে। এ প্রতিরোধ বাহিনীর প্রধান দু'টো সংগঠন হচ্ছে Moro Liberation Front (MLF) এবং Moro Islamic Liberation Front (MILF)। প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে মরো সশস্ত্র সংগঠনগুলো পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে একই ধরনের আক্রমণ চালাতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় মরো মুসলিমরা অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে যায়। জনসংখ্যার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রিস্টান শাসকগণ ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চল থেকে অনেক খ্রিস্টানকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে ১৯৩৯ সালে মাগিনদানাও সুলতান কুদরত প্রদেশে যে মুসলিম–খ্রিস্টান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫৫ : ৪৫ সেখানে ১৯৪৮ সালে মুসলিম–খ্রিস্টান অনুপাত দাঁড়ায় ৩৫ : ৬৫।

আন্তর্জাতিকভাবে খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহের সহায়তা এবং ফিলিপিনো খ্রিস্টানদের আগ্রাসী আচরণ মুসলিমদেরকে পরাস্ত করতে পারেনি। ইমানি উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত মরো মুসলমানদের

www.waytojannah.com

প্রবল প্রতিরোধ খ্রিস্টানদেরকে সমস্যা সমাধানে আলোচনায় বসতে বাধ্য করে। তারা তাদের পূর্বতন সিদ্ধান্ত 'extra ecclesiam nulla salus' (out-side the church there is no salvation) এই মতবাদ থেকে ফিরে আসে এবং মুসলমানদেরকে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেয়।

মরো মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা : স্পেনীয়, আমেরিকান এবং ফিলিপিনো খ্রিস্টান গ্রুপ (বিসিয়ান এবং তাগালগ গ্রুপ) সার্বিক চাপ প্রয়োগ করেও মুসলমানদের কাবু করতে না পেরে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। যেহেতু ফিলিপিনো খ্রিস্টানগণ অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক, তাই ভ্যাটিকান চার্চের দ্বিতীয় কাউন্সিলও মুসলমানদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় চার্চকে উৎসাহিত করে। যার ফলে ফিলিপাইনের জাতীয় সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে মরো মুসলিমদের জন্য ইসলামভিত্তিক মুসলিম ব্যক্তিগত আইন অনুমোদন দেয়। যার মাধ্যমে বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির রক্ষণ ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইন স্বীকৃতি পায়। তা ছাড়া ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিমদের জন্য ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলা হয়। শরিয়াভিত্তিক লেনদেনের জন্য আল–আমানা ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশে শরিয়া কোর্টও স্থাপন করা হয়। ১৯৭৯ সালে হজব্রত পালনের সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Philippine Pligrimage Authority প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ১৮৯০টি মাদ্রাসা আছে। ১৯৭৭ সালে ফিলিপাইনের জাতীয় সরকার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে আধা–স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু হাজারো নির্যাতনে জর্জরিত, সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত এবং উন্নয়নের মূল ধারা থেকে উপেক্ষিত মুসলিমগণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। এখনো মরো মুসলিম ও ফিলিপিনো সরকারের সাথে মাঝে মধ্যে আলোচনা হয় এবং অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আলোচনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী সমাধানে আসা গেলে উভয় পক্ষই উপকৃত হবে।

সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন নমুনা

১। ফিলিপাইনের পরিচয় দাও।
২। ফিলিপাইনের কয়েকটি দ্বীপের নাম লিখ।
৩। ফিলিপাইনের কয়েকটি মুসলিম গোত্রের নাম লিখ।
৪। 'মরো' শব্দটির উৎপত্তিগত বিবরণ দাও।
৫। ফিলিপাইনের মুসলিমদের 'মরো মুসলিম' বলা হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফিলিপাইনে মুসলমানদের আগমন এবং ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস বর্ণনা কর।
২। ফিলিপাইনের মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের সংঘর্ষের পর্যায়ক্রমিক বিবরণ দাও।

www.waytojannah.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সিঙ্গাপুরে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন

সিঙ্গাপুর : দেশ পরিচিতি : দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার একটি ছোট্ট দ্বীপ দেশ সিঙ্গাপুর। ছোট এই দেশটিকে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক রাজধানী (Financial and commercial capital) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর আয়তন হচ্ছে ২৫০ বর্গমাইল (৬৪৮ বর্গকিলোমিটার)। দেশটির জনসংখ্যা হচ্ছে ৪.৩ মিলিয়ন তথা ৪৩ লাখ। এর মধ্যে বৌদ্ধ হচ্ছে ৫৫ শতাংশ, তাওবাদী ২২ শতাংশ, মুসলমান ১৬ শতাংশ এবং হিন্দু–খ্রিস্টান ও শিখ ৭ শতাংশ। ১৯৬৩ খ্রি. যখন মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে তখন সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার একটি প্রদেশ ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর একটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সিঙ্গাপুরে ইসলামের আগমন : প্রাচীনকাল থেকে মালয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে আরবীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর এ বাণিজ্যিক যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। যেসব বণিক মালয় দ্বীপপুঞ্জে গমন করতেন তাদের মাধ্যমে প্রথমে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনে ইসলামের দাওয়াত পৌছায়। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরব, ইয়েমেন ও পারস্য হতে অনেক ধর্ম প্রচারক ও ওলিয়ে কামেল এসব অঞ্চলে এসে আস্তানা গড়ে তোলেন এবং নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যান এবং তাদের সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূও হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত ইসলামের এ প্রচার কাজ নির্বিঘ্নে চলেছিল। যার কারণে আজকের ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। সিঙ্গাপুর একসময় মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচারের সময়কালে সিঙ্গাপুরে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার সালাবিস দ্বীপে বুগি নামে একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আছে। এরা ছিল দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে সাহসী, উদ্যোগী এবং দক্ষ নাবিক। ষোড়শ শতাব্দীতে তাদের বাণিজ্য পোত—নিউগিনি উপকূল থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সকল দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করত। এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং বাণিজ্যিক তৎপরতার সাথে ইসলাম প্রচারকেও তারা তাদের

www.waytojannah.com

জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিল। সুতরাং সিঙ্গাপুরে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা থাকবে—এটা নিঃসন্দেহ।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ মুসলমান ছিল মালয়েশিয়ার অধিবাসী এবং মালয়েশিয়ান মুসলমানেরা সিঙ্গাপুরে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ কলোনিতে পরিণত হওয়ার পূর্বে মালয়েশিয়ানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। তাই সিঙ্গাপুরকে বলা হত 'Out-post of Malayasia' বা সীমান্তসংলগ্ন মালয়ীদের আবাসস্থল। ১৮১৯ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে সিঙ্গাপুরে চীনাদের ব্যাপক আগমন ঘটে, যার ফলে মালয়েশিয়ানরা সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হয়। যা হোক ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ কলোনিয়াল অথরিটি 'মোহামেডান অ্যাডভাইজারি বোর্ড' (Mohammadan Advisory Board) গঠন করে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইসলামি রীতি-নীতির অনুসরণকে সংরক্ষণ ও অনুমোদন দেয়। সিঙ্গাপুর সরকারও বিভিন্ন সংস্কৃতির জনগণকে নির্দিষ্ট এলাকাতে সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ মুসলিম শাফেয়ি মাজহাবের (Shafi School of thought) অনুসারী। তবে এখানে হানাফি মাজহাবের (Hanafi School of thought) অনেক অনুসারী রয়েছে। শিয়াদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

মুসলিমদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ : সিঙ্গাপুর সরকার তাদের সংবিধানের ১৫২ ও ১৫৩ ধারায় মালয় ও মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছে। ১৯৬৬ সালে সিঙ্গাপুর পার্লামেন্ট Administration of the Muslim Law Act নামে একটি আইন পাস করে। এই আইনটি ১৯৬৮ সালে কার্যকর করা হয়। যার মাধ্যমে মুসলমানদের বিষয়-আশয়গুলো সমাধান, সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয় এবং ক্ষমতা ও আওতা (Powers and jurisdiction) নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—(১) The Islamic Religion Council of Singapore, (২) The Shariyah court এবং (৩) The Registry of Muslim Marriages. এই প্রতিষ্ঠানগুলো Ministry of Community Development, youth and sports (MCYS)-এর তত্ত্বাবধানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সিঙ্গাপুরে মুসলমানদের সংগঠনসমূহ : সিঙ্গাপুরে মুসলমানদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাইরে তাদের স্বেচ্ছাসেবী জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। এ সংগঠনগুলো নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। এগুলোর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন হলো—(১) Association of Muslim Professionals, (২) Muslim Missionary Society, (৩) Singapore Islamic Scholars and Islamic Teachers Association এবং (৪) Islamic Theological Association of Singapore. উল্লিখিত সংগঠনসমূহে দলমত নির্বিশেষে সিঙ্গাপুরের সকল মুসলিম অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও সিঙ্গাপুরে অঞ্চলভিত্তিক এবং মাজহাবভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে। নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

www.waytojannah.com

(১) Indian-Muslim Organisation : ভারত থেকে আগত মুসলমানদের সিঙ্গাপুরের কয়েকটি সংগঠন রয়েছে। এরা বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলিমদের উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সাহায্য করে থাকে। এ ধরনের কয়েকটি সংগঠন হলো—(১) Fedaration of Indian Muslims, (২) Singapore Tenkasi Muslim Welfare organisation ও (৩) United Indian Muslim Association প্রভৃতি।

(২) Religio-Culture group : সিঙ্গাপুরে মুসলিমদের কয়েকটি ধর্মীয় সংস্কৃতির সংগঠন রয়েছে। যেমন—(১) আল উশরাহ আল–দানদার বিয়াহ, (২) নক্সবন্দি হাক্কানি সিঙ্গাপুরে প্রভৃতি।

ধর্মীয় মাজহাবভিত্তিক সংগঠন : শিয়া সংগঠন : শিয়াদের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে। তন্মধ্যে ১২ ইমামে বিশ্বাসী দল বা the Twelvers এবং ৭ ইমামে বিশ্বাসী দল বা The Sevenides বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে The Jeatari Muslim Association সমধিক প্রসিদ্ধ। এছাড়াও শিয়াদের অন্যান্য গ্রুপ যেমন বাহায়িদেরও সংগঠন রয়েছে। শিয়াদের ইসমাইলীয় শাখা (সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী) যার বর্তমান ইমাম হচ্ছেন দি আগা খান। এই আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক সিঙ্গাপুরে একটি সেন্টার স্থাপন করেছে।

হানাফি মাজহাব মুসলিম কমিউনিটি : হানাফিরা হচ্ছে সুন্নি মুসলমানদের যে চারটি School of Throught রয়েছে তার অন্যতম একটি। হানাফিগণ সিঙ্গাপুরে একটি মসজিদ কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দারুল আরকাম সিঙ্গাপুরে : 'দারুল আরকাম' সিঙ্গাপুরে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হচ্ছে যে সমস্ত অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয় তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করা। সকল সম্প্রদায়ের ব্যাপারে দারুল আরকাম সাধ্যানুযায়ী সাপোর্ট প্রদান করে থাকে।

সিঙ্গাপুরে মসজিদ ও মাদ্রাসা : সিঙ্গাপুর একটি নগরায়িত দেশ বা City Country। এখানে ৬৯টি মসজিদ রয়েছে। শুধুমাত্র একটি মসজিদ Masjid Temernggong Daeng Ibrahim (মসজিদ টেমেরাংগং ডায়েং ইব্রাহীম) জহর প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত। বাকি সব মসজিদ MUIS বা Muslim Institution of Singapore কর্তৃক পরিচালিত হয়। ২০০৯ সালে Mosque Building and Mendaki Fun (MBMF) কর্তৃক ২৩তম মসজিদ হিসেবে মসজিদ আল–মাওয়াদ্দাহ উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও সিঙ্গাপুরে 'মসজিদে সুলতান' (The Sultan Mosque) এবং মসজিদে হাজ্জাহ ফাতিমা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। মসজিদে সুলতান ১৮২৪ সালে নির্মিত হয় এবং ১৯৭৩ সালে সিঙ্গাপুর সরকার এটিকে National Monument বা জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে ঘোষণা করে। এভাবে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে সিঙ্গাপুরে মসজিদগুলো নির্মিত হচ্ছে। সিঙ্গাপুরে ছয়টি পূর্ণকালীন মাদ্রাসাও রয়েছে। যেখানে মুসলিম ছাত্ররা দ্বীনি শিক্ষা লাভ করে থাকে।

www.waytojannah.com

উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুর একটি প্রগতিশীল দেশ। সাংবিধানিকভাবে বিভিন্ন জাতি–গোষ্ঠীর বিশেষ করে মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকার একটি ঐক্যবদ্ধ স্থিতিশীল দেশ ও জাতি গঠনে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এজন্য সিঙ্গাপুরে মুসলিম নিপীড়নের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় না। একটি স্থিতিশীল দেশ হিসেবে সিঙ্গাপুর তাই দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১ (ক) সিঙ্গাপুরের পরিচয় দাও।
(খ) ধর্মীয় ভিত্তিতে সিঙ্গাপুরে জনসংখ্যার হার নির্ণয় কর।

২ (ক) সিঙ্গাপুর কত খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে?
(খ) সিঙ্গাপুরকে 'Out-post of Malyaesia' বলা হত কেন?

৩ (ক) ধর্মীয় মাজহাবের ভিত্তিতে সিঙ্গাপুরের মুসলিমগণ কয় ভাগে বিভক্ত?
(খ) কত সালে ব্রিটিশ কলোনিয়াল অথরিটি মুসলমানদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সিঙ্গাপুরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। সিঙ্গাপুর সরকার কর্তৃক সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ দাও।

৩। সিঙ্গাপুরে অঞ্চল ও মাজহাবভিত্তিক মুসলমানদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রম আলোচনা কর।

www.waytojannah.com

সপ্তম অধ্যায়

মায়ানমার (বার্মা) রোহিঙ্গা মুসলিমদের ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান সমস্যা ও জীবনধারা

মায়ানমার (বার্মা) : দেশ পরিচিতি : মায়ানমার—প্রাচীন নাম বার্মা ১৯৮৯ সালের ১৮ জুন সে দেশের সরকার বার্মা নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেয় মায়ানমার। বাংলাদেশের দক্ষিণ–পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি প্রতিবেশী দেশ। এদেশটির সাথে রয়েছে বাংলাদেশের ১৭১ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত। সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত 'নাফ' নদীর অপর তীরে অবস্থিত মায়ানমারের একটি প্রদেশ যার বর্তমান নাম রাখাইন স্টেট। এর আগের নাম ছিল আরাকান রাজ্য। এই আরাকান রাজ্য বা রাখাইন স্টেট হচ্ছে মূলত রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদি নিবাস।

আরাকান রাজ্যের পরিচয় : ১৯৭৪ সালে বার্মা সরকারপ্রধান নে উইন আরাকান রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে রাখাইন স্টেট রাখেন। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ–পূর্ব সীমান্ত নাফ নদীর অপর পাড়ে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী পাহাড়–বনানী পরিবেষ্টিত একটি প্রদেশ। মায়ানমারের সুউচ্চ, দুর্গম ও প্রলম্বিত ইয়োমা পর্বতমালা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো মূল মায়ানমার থেকে আরাকানকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ব্রিটিশ শাসিত আরাকানের আয়তন ছিল ২০ হাজার বর্গমাইল। ১৯৪৮ সালে উত্তর পার্বত্য আরাকান বার্মার চীন প্রদেশে এবং দক্ষিণ আরাকানের কিছু অংশ ইরাবতী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমানে এর আয়তন দাঁড়িয়েছে ১৪,২০০ বর্গমাইলে। আরাকানের দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল এবং প্রশস্ততায় স্থানবিশেষে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর আরাকান প্রস্থে ১৫০ মাইল এবং দক্ষিণে ক্রমশ সরু হতে হতে ২০ মাইল প্রশস্ততা নিয়ে সাগরকূলে মিলিত হয়েছে। নাফ (Naf), মায়ু (Mayu), কালাদান (Kaladan), লেমব্রু (Lembru), অনন (Anon), তানগু (Tangu) ও সান্দোওয়ে (Sandoway) নামে আরাকানে সাতটি নদী রয়েছে। কালাদান আরাকানের সবচেয়ে বড় নদী, যা হিমালয়ে উৎপন্ন হয়ে আরাকানের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

আরাকান একটি পার্বত্যময় ঘন বন পরিবেষ্টিত উপকূলীয় অঞ্চল। এখানে সমুদ্রতট সংলগ্ন অনেকগুলো দ্বীপ আছে, যার মধ্যে রাহাম্ব্রি ও চেদুবা সবচেয়ে বৃহৎ। রাহাম্ব্রিতে একটি প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় আছে। যাতে এ গভীর পোতাশ্রয়ে সপ্তম নৌবহরের মতো জাহাজগুলোর সংকুলান হওয়া সম্ভব। আরাকানে মোট ১৭টি শহর আছে। এর মধ্যে আকিয়াব এবং মংডু বাংলাদেশীদের কাছে অতি পরিচিত। আকিয়াব হচ্ছে আরাকানের প্রধান সমুদ্রবন্দর। সমগ্র আরাকানে কোনো রেলপথ নেই। সকল মৌসুমে গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা মাত্র ১৫০ মাইল। ইয়োমা পর্বতের মধ্য দিয়ে কয়েকটি দুর্গম গিরিপথ আরাকান ও বার্মার মধ্যেই স্থল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। তা ছাড়া জলপথ হচ্ছে যোগাযোগের আরেকটি মাধ্যম তবে তা সব সময় উপযোগী নয়। এজন্য চট্টগ্রামের সাথেই আরাকানিদের যোগাযোগ রক্ষা অধিকতর সহজ এবং এজন্যই হাজার বছর ধরে আরাকানিদের সাথে চট্টগ্রামের সম্পর্ক বিদ্যমান।

আরাকানের জনসংখ্যা : খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রি. পর্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৭৮৫ খ্রি. বর্মারাজ বোধপায়া (১৭৮২–১৮১১ খ্রি.) সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে আরাকানের শেষ রাজা থামাডাকে পরাজিত ও নিহত করে আরাকানকে বার্মার অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকে অদ্যাবধি এটা বার্মার একটি প্রদেশ হিসেবে বিদ্যমান আছে। আরাকানের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ মুসলমান। রোহিঙ্গা ছাড়াও এখানে থাম্ভইক্য, জেরবাদা, কামানছি প্রভৃতি জাতির মুসলমান রয়েছে, তবে রোহিঙ্গারা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আরাকানের জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভ করা খুবই কঠিন। স্বাধীনতা–উত্তর বার্মার আরাকানে কোনো আদমশুমারি হয়নি। যার কারণে জনসংখ্যার বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আরাকানের বিভিন্ন লেখকদের রচনা এবং পত্র–পত্রিকার তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে জনসংখ্যার তথ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, বাংলাদেশের কিছু পত্র–পত্রিকা এবং রোহিঙ্গা লেখকদের মতে আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ। তার মধ্যে ৩০ লক্ষ রোহিঙ্গা, যা মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক আব্দুল করিমের মতে, আরাকানের জনসংখ্যা ৪০ লাখ। তন্মধ্যে ২০ লাখ মগ–বৌদ্ধ, ১৪ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান, ৪ লাখ সর্বপ্রাণবাদী এবং ২ লাখ হিন্দু ও খ্রিস্টান।

রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি : মায়ানমার (বার্মা) রাষ্ট্রের আরাকান (বর্তমান রাখাইন স্টেট) রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীদের 'রোহিঙ্গা' নামে অভিহিত করা হয়। জন্মগতভাবে (Bybirth) রোহিঙ্গারা আরাকানের নাগরিক এবং তাদর রয়েছে হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস। ইসলামের আগমনের ৫০ বছরের মধ্যে আরাকানে (৬১০–৬৬০ খ্রি.) মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অষ্টম শতাব্দী থেকে আরাকান উপকূলে আরবীয় বণিকদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং আরাকান রাজ্যে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে।

বলা হয়ে থাকে যে, স্বাধীন আরাকান রাজ্যের ম্রাউক উ বংশের রাজা নরমিখলা 'ম্রোহং'–এ তার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ম্রোহং–এর বাংলা উচ্চারণ রোসাং, রোসাং–এর

www.waytojannah.com

অধিবাসীদেরকে 'রোসাইংগা' বলা হত। কালক্রমে এটি পরিবর্তিত হয়ে 'রোহিঙ্গা' নাম ধারণ করে।

অন্য একটি মতে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজা মহৎ-ইঙ্গ-চন্দ্রের (৭৮০-৮১০ খ্রি.) রাজত্বকালে আরবের মুসলিম বণিকগণ বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচারের জন্য আরাকানের আকিয়াব বন্দরসহ দক্ষিণ-চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। সে সময়ে কয়েকটি বাণিজ্য জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে আরাকানের রাহাম্ব্রি দ্বীপের কাছে বিধ্বস্ত হয়। জাহাজের আরোহীরা আরবীয় ছিলেন বিধায় তারা 'রহম' (দয়া) কর বলে চিৎকার করলে স্থানীয় জনগণ তাদেরকে উদ্ধার করে। আরাকান রাজ তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণ দেখে তাদেরকে সেখানে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ স্থানীয় অধিবাসীগণ তাদেরকে 'রহম' জাতির লোক মনে করে 'রহম' বলে ডাকত, পরবর্তীতে স্থানীয়দের মাধ্যমে এ শব্দটি রহম—> রোঁয়াই —> রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা রূপ লাভ করে।

মুসলিমদের আগমন ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি : এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামের আগমনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (৬১০-৬৬০ খ্রি.) আরাকানের মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে আরাকানের বিভিন্ন স্বাধীন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। চন্দ্র-সূর্য বংশের প্রথম রাজা মহৎ ইঙ্গচন্দ্র (৭৮৮-৮১০ খ্রি.) বিশালীতে তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য বণিকগণ এখানে ইসলাম প্রচার মিশন পরিচালনা করে এবং মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধি পেতে থাকে। ১০০৫ খ্রি. পঁগা রাজবংশ আরাকান দখল করে করদ রাজ্যে পরিণত করে। সে সময় অনেক মুসলমান এবং আরব বণিকগণ পঁগা রাজার দেহরক্ষী বাহিনী এবং সেনাবাহিনী ও নাবিক হিসেবে কাজ করা শুরু করে। দূরবর্তী মিশনে এরা তাদের স্ত্রীদের সাথে আনত না, সুতরাং তারা এখানকার বর্মী মেয়েদের ইসলামে দীক্ষিত করে বিয়ের মাধ্যমে ঘর-সংসার শুরু করে। ফলে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে যেসব আরব বণিক ও সুফি দরবেশ আরাকানে আগমন করেন তাদের মধ্যে বদরুদ্দীন সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি আরাকান ও বাংলা মুল্লুকে 'বদরশাহ' নামে পরিচিত। তার নামানুসারে আসামের প্রান্ত থেকে শুরু করে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত অনেক স্থানের নাম 'বদর মোকাম' রাখা হয়েছে এবং তার নামে অনেক মসজিদও নির্মিত হয়েছে। আজো মাঝি-মাল্লা এবং নাবিকরা তাকে 'দরিয়া পীর' হিসেবে স্মরণ করে এবং তার নামে 'মানত' করে। তার আগমনে এই এলাকায় ইসলামের দ্রুত বিস্তার ঘটে।

আরাকান রাজ নরমিখলা ১৪০৪ খ্রি. সিংহাসনে আরোহণ করে অনুনথিউ নামে জনৈক সামন্তরাজের বোন চৌবোঙ্গিকে জোরপূর্বক গ্রহণ করেন। অনুনথিউ তার বোনের প্রতি এ অবমাননার প্রতিকারের জন্য বর্মীরাজ মোঙশেওয়াইয়ের (১৪০১-১৪২২ খ্রি.) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি ১৪০৬ খ্রি. ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করেন। নরমিখলা

www.waytojannah.com

পলায়ন করে ইলিয়াসশাহী বংশের গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু নরমিখলাকে সাহায্য করার আগেই গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ মৃত্যুবরণ করেন। ইতোমধ্যে গৌড়ে অনেক ঘটনা ঘটে। রাজা গণেশ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার সিংহাসনে বসেন। পরে তিনি তার পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যদু জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ১৪৩০ খ্রি. ওয়ালী খানের (বর্মী ইতিহাসে উলু–খৈঙ) সেনাপতিত্বে ২০ হাজার সৈন্যকে নরমিখলার সাথে প্রেরণ করেন। কিন্তু ওয়ালী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে নরমিখলাকে বন্দি করে। নরমিখলা কৌশলে পালিয়ে আবার জালালউদ্দীনের নিকট এলে এবার তিনি সিন্ধি খানের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। সিন্ধি খান ওয়ালী খানকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং নরমিখলাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। দু'বার আগত এ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আর বাংলায় ফিরে আসেনি। তারা আরাকানি রমণীদের বিয়ে করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এভাবে আরাকানে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৬০ খ্রি. সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা আওরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত হয়ে আরাকানে পালিয়ে এসে ম্রোহংয়ে আরাকান রাজ চন্দ্রসুধর্মার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে সুধর্মার হাতে নিহত হন। কিন্তু সুজার অনুচরেরা সবাই আরাকানে থেকে যান। তা ছাড়া ইসলাম প্রচারের ফলে আরাকানের অনেক আদিবাসী, যেমন—থাম্ভইক্য, জেরবাদি, কামানদিসহ বিভিন্ন গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আরাকান একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়। তা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে প্রজনন হার বেশি হওয়ার কারণেও এখানে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুসলমানদের বিপর্যয় শুরু : মুসলমানরা একটি শান্তিপ্রিয় ও সহনশীল জাতি হিসেবে আরাকানে নিরুপদ্রব জীবনযাপন করে আসছিল। ২৬৬৬ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রি. পূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পর্যন্ত আরাকান মোটামুটিভাবে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৭৮৫ খ্রি. বর্মীরাজ বোধপায়া (১৭৮২–১৮১১ খ্রি.) এক সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে আরাকানের শেষ রাজা থামাডাকে পরাজিত করে আরাকান দখল করে নেয় এবং অদ্যাবধি আরাকান বার্মার একটি প্রদেশ হিসেবে বিদ্যমান। বর্মীরাজ বোধপায়া ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করার পর অনেক মুসলমানকে হত্যা করে। সে সময় পাঁচ লক্ষাধিক লোক প্রাণভয়ে বাংলায় পালিয়ে আসে। ১৮২৩ সালের ইঙ্গ–বর্মী যুদ্ধের পর আরাকান ইস্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন এলে সেখানে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পালিয়ে আসা আরাকানিদের অনেকে তাদের স্বদেশে ফেরত যায়। বলতে গেলে বোধপায়ার আরাকান দখল থেকে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের যে খড়গ নেমে আসে সেই থেকে আজ ২৩০ বছর ধরে আরাকানি মুসলমানরা অমানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে অস্তিত্বের সংকট নিয়ে কালাতিপাত করছে। কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যার মতো আরাকানি মুসলিম তথা রোহিঙ্গা মুসলিম সমস্যা আজ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

www.waytojannah.com

রোহিঙ্গা মুসলিম নির্মূল করার জন্য বর্মী-মগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন অভিযান ও নিবর্তনমূলক কার্যক্রম :

১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি বার্মা ইংরেজদের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্যায়ে বার্মা সরকার রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল রোহিঙ্গাদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূল করে দেয়া বা Ethic cleansing যা সর্বতোভাবে মানবতা, সভ্যতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী। নিচে এ সম্পর্কে একটি তালিকা প্রদান করা হল :

সংখ্যা	অপারেশনের নাম	অপারেশন এলাকা	সাল
১.	বি.টি.এফ. অপারেশন (Burma Territoria Force Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৪৮
২.	কমবাইন্ড ইমিগ্রেশন অ্যান্ড আর্মি (Combined Immigration & Army)	উত্তর আরাকান	১৯৫৫
৩.	ইউ.এম.পি. অপারেশন (Union Military Police Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৫৫-৫৯
৪.	ক্যাপ্টেন হ্টিন ক্যাইউ অপারেশন (Captain Htin Kyaw Operation)	বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন এলাকা	১৯৫৯
৫.	শিউ কাই অপারেশন (Shew Kyi Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
৬.	কাইগান অপারেশন (Kyigan Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
৭.	নাগাজিনকা অপারেশন (Nagazinka Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৭-৬৮
৮.	মাইয়াট মন অপারেশন (Myat Mon Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৯-৭১
৯.	মেজর অং থান অপারেশন (Major Aung Than Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৭৩
১০.	সেব অপারেশন (Sabe Operation)	সমগ্র আরকান	১৯৭৪
১১.	নাগামিন (ড্রাগন) অপারেশন [Nagamin (Dragon) Operation]	সমগ্র আরাকান	১৯৭৮

অত্যাচার ও নির্যাতনের এখানেই শেষ নয়। বার্মার মগ সরকার এরপর আরাকানের নাম পরিবর্তন করে 'রাখাইন স্টেট' ঘোষণা করে আরাকানি বৌদ্ধ-মগদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। বার্মা সরকারের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় মগ-বৌদ্ধরা

www.waytojannah.com

মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু করে। গৌতম বুদ্ধের অহিংস বাণীর ধারক হয়েও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংস হতে তাদের এতটুকু বাধেনি। এ যেন বুদ্ধের প্রতি মগদের এক নিষ্ঠুর পরিহাস। রোহিঙ্গাদের নির্মূলে তারা কত দাঙ্গা করেছে তার পূর্ণ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তাই এখানে মারাত্মক কয়েকটি দাঙ্গা ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার নাম দেয়া হলো—

সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	সাল
১.	আকিয়াব (Akyab)	১৯৬৭, ১৯৭৬, ১৯৮৫
২.	কাইউক পাইয়ু (Kyaukpya)	মার্চ ১৯৭৬
৩.	স্যান্ডুয়ে (Sandoway)	১৯৭৮, ১৯৮৪
৪.	টংগুপ (taungup)	মে ১৯৮৪
৫.	গাওয়া (Gwa)	১৯৮৪
৬.	রাহাম্রি (Rahamri)	মার্চ ১৯৭৬
৭.	বুচিদং (Buthidaung)	১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৫
৮.	মংডু (Maungdaw)	১৯৬৭, ১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৮৫
৯.	চেদুবা (Cheduba)	১৯৮৪

বার্মা সরকার কর্তৃক অন্যান্য নিবর্তনমূলক কার্যক্রম :

বার্মার মগ সরকার কর্তৃক আরাকান রাজ্যসহ (বর্তমান নাম রাখাইন স্টেট) পুরো বার্মাতে সরকার কর্তৃক জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান এবং দাঙ্গার প্ররোচনা ও দাঙ্গা সৃষ্টিতে সহায়তা দিয়ে মুসলিম নিধন ছাড়াও বিভিন্ন নিবর্তনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধ্বংস ও কোণঠাসা করে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি নিবর্তনমূলক কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হল :

(ক) মুসলমানদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপর অধিক হারে করারোপ করা হয়। কর আদায়ে অসমর্থ হলে তাদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয় এবং জীবনধারণের জন্য বাৎসরিক মজুদকৃত খাদ্যদ্রব্য জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হয়।

(খ) বিভিন্ন অজুহাতে অনেক অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

(গ) মসজিদ, মাদ্রাসা ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

(ঘ) মুসলমানদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য বাজেয়াপ্ত ভূমিতে মগদের পুনর্বাসন করা হয়।

(ঙ) রোহিঙ্গাদের যাতায়াতের উপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়। এমনকি এক থানা থেকে অন্য থানায় বিনা অনুমতিতে যেতে দেয়া হয় না।

(চ) রোহিঙ্গা নারী–পুরুষদেরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলক বিনা মজুরিতে শ্রমে খাটানো হয়। পারিশ্রমিক দাবি করলে অথবা শ্রম না দিতে চাইলে হত্যা করা হয়।

(ছ) সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহকরণে বাধ্য করা হয়।

www.waytojannah.com

(জ) রোহিঙ্গা যুবতীদেরকে অনেক সময় জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

(ঝ) রোহিঙ্গা মুসলমানদের হজে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না।

(ঞ) রাহাম্রি গাওয়ারসহ অন্যান্য এলাকার মসজিদ ভেঙে দেয়া হয় এবং মুসলমানদের কবরস্থান দখল করে গণ–পায়খানা ও শূকরের চারণভূমিতে পরিণত করা হয়।

(ট) মুসলিম ঐতিহ্য এবং কোরান–হাদিসের বই ধ্বংস করা হয়। কোরান–হাদিসের পাতা দিয়ে প্যাকেট (প্যাকেজিং) তৈরি করা হয়।

(ঠ) সাধারণভাবে কোরবানির অনুমতি দেয়া হয় না।

(ড) ২০১৩ সালে মগ সরকার আরেকটি নিবর্তনমূলক আইন চালু করেছে। এতে মুসলমানদের দুইয়ের বেশি সন্তান জন্মদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এসব নিবর্তনমূলক কার্যক্রম এখনো অব্যাহত গতিতে চলছে।

রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থা : মায়ানমার তথা বার্মাতে অব্যাহতভাবে মানবিক বিপর্যয় ঘটেই চলেছে এবং এই অব্যাহত মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে মুসলমানগণ। পর্যবেক্ষকগণের অভিমত হচ্ছে মায়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় আরাকান বা রাখাইন প্রদেশ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেশটির কেন্দ্র ভেদ করে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সবচেয়ে বেশি নিবর্তনমূলক আইন ও জাতিগত নির্মূল অভিযানের শিকার রোহিঙ্গা মুসলমানগণ। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' জাতিগত এসব দাঙ্গা দমনে বার্মা সরকারের নিস্পৃহ ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। Human Rights Watch স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য–উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানায় যে, ১৩টি এলাকার ৫টির ৩৪৮ একরে বসবাসরত রোহিঙ্গা মুসলমানদের ৪ হাজার ৮৬২টি অবকাঠামো/বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালের ২৩ অক্টোবর 'ইয়াহ থেই' গ্রামে ওই বর্বর হামলা ছিল একটি জঘন্যতম ঘটনা। ওই হামলায় ৭০ জন নিহত হয়, যার মধ্যে ২৮ জন ছিল শিশু। Human Rights Watch এই আক্রমণের জন্য স্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ২০১০ সালে জন্ম নেয়া Rakhaine Nationlist Development Party-কে অভিযুক্ত করেছে। এর আগে ২০১২ সালের জুন মাসে আরাকানে মুসলিমবিরোধী ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। সেই দাঙ্গায় ২৫০ জন রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত এবং ১৪০,০০০ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়। গৃহহীন এসব মুসলিমকে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় দেয়া হয়। সেখানে তাদেরকে পর্যাপ্ত মানবিক সাহায্যও দেয়া হচ্ছে না। Human Rights Watch-এর ব্যাংক অফিসের কর্মকর্তা Mathu Smith সিএনএন–কে বলেছেন যে, জুন থেকে অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত পরিচালিত দাঙ্গায় রোহিঙ্গা নির্মূল অভিযান উত্তুঙ্গে ওঠে। বৌদ্ধ–মগ ভিক্ষু সংগঠনসমূহ এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল সরকারি মদদে রোহিঙ্গা নির্মূল অভিযানে মদদ দেয় এবং তারা বিভিন্ন উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মগদেরকে সংগঠিত করে। সেনাবাহিনী তল্লাশি অভিযানের নামে রোহিঙ্গাদের আত্মরক্ষামূলক সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয় এবং অনেককে বন্দি করে নিয়ে যায়। আর এ সুযোগে বৌদ্ধ–মগরা রোহিঙ্গাদের

www.waytojannah.com

ধ্বংসসাধন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বার্মা সরকারের বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইনের কারণে রোহিঙ্গারা আরো বেশি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। স্বদেশ ভূমিতে তারা এখন পরবাসীতে পরিণত হয়েছে। ১৯৮২ সালে বার্মার নে উইন সরকার যে নাগরিকত্ব আইন প্রবর্তন করে সেখানেও রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্বের বাইরে রাখা হয়েছে। অথচ বার্মায় বসবাসরত ১৩৫টি স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠীকে নাগরিক অধিকার (নাগরিকত্ব) দেয়া হলেও রোহিঙ্গাদের করা হয়েছে বঞ্চিত।

পুরো বার্মায় মুসলমানদের বিপর্যয়কর অবস্থা : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাখাইন স্টেটের সাম্প্রদায়িকতার আগুন দেশটির কেন্দ্র ভেদ করে পূর্ব, উত্তর এবং মধ্যাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। রয়টার্স পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, ২০১৩ সালের মার্চ মাসে দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় শহর ইয়েথেমিন, তাতকোন ও মেইকটিলা ওহ দ্য কুনে শহরসহ অন্যান্য জায়গায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। মিয়ানমারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ শান। চীন সীমান্তবর্তী এই প্রদেশের রাজধানী লাশিও। বিভিন্ন উপজাতি ও ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এ প্রদেশের ঐতিহ্য। কিন্তু হঠাৎ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নেতৃত্বে কয়েকশ লোক লাঠিসোঁটা আর রড নিয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা লাশিওর সবচেয়ে বড় মসজিদ, এতিমখানা ও কয়েকটি দোকানে আগুন দেয়। ইয়েথেমিন শহরে কমপক্ষে ৪৩টি মসজিদ ও বাড়ি পোড়ানো হয়। মেইকটিলাতে ৫০ জন নিহত হয় এবং অনেক মসজিদ ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। উগ্র বৌদ্ধদের হামলায় মেইকটিলাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহরের প্রধান ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হেমরাতুল ইসলাম মাদ্রাসা। হামলায় ওই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি ওয়াজেদসহ চারজন শীর্ষ আলেম এবং ২৮ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। উগ্রবাদী বৌদ্ধরা 'ওহ দ্য কুনে' শহরেও মুসলমানদের বাড়িঘর ও মসজিদে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে। ইয়ামেনথিন শহরেও মগ-বৌদ্ধরা একটি মসজিদসহ ৫০টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। অতিসম্প্রতি আরাকান রাজ্যের উপকূলীয় শহর থান্দাবিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নেতৃত্বে মুসলিম পাড়াতে আক্রমণ চালানো হয়। এতে ৭০টি মুসলিম বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

ব্যাংককের সুশীল সমাজ মায়ানমারের ঘটনাপঞ্জি মনিটর করে চলেছে এবং তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে তার সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তাদের ভাষ্য হলো—হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে মানবিক সাহায্যটুকুও প্রদান করা হচ্ছে না। তাদেরকে তাদের বাড়িঘরেও যেতে দেয়া হচ্ছে না। রোহিঙ্গারা একটি অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছে। OIC (Organization of Islamic Conference) রোহিঙ্গাদের সাহায্যের জন্য মায়ানমারে একটি লিয়াজোঁ অফিস স্থাপনের অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু মগ সরকার সেটিও প্রত্যাখ্যান করেছে। তা হলে সমাধানের আশা কীভাবে ব্যক্ত করা যায়?

রোহিঙ্গা ও মুসলিম হত্যার ইন্ধনদাতা সংগঠনসমূহ :

(ক) বৌদ্ধ সংঘসমূহ : আরাকান এবং মায়ানমারে মুসলমানদের উপর আক্রমণ, হত্যা এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার পিছনে স্থানীয় বৌদ্ধ সংঘসমূহ সরাসরি অংশগ্রহণ করে। ANN/Eleven Media group-এর রিপোর্টার বর্মি নাগরিক থান টুট অং (Than Tut

www.waytojannah.com

Aung) বলেন, 'Nationalism is part of a wave of anti-Muslim violence instigated by rightwring groups. It has never been the practice of Myanmar's people to burn the homes of people of other religions.'

(খ) Rakhaine Nationalist Development Party : সাম্প্রতিক RNDP নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন আরাকানে গঠন করা হয়েছে। এ সংগঠনটি রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ছড়ানোর কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং মগদেরকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিয়ে দাঙ্গা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে।

(গ) মিয়ানমার ৯৬৯ গ্রুপ : এই গ্রুপটির নেতা হলো আশিন উইরাথু নামের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে ২০০৩ সালে তাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। ২০১২ সালে তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। জেল থেকে বের হয়ে সে মায়ানমারকে মুসলিমমুক্ত করার ঘোষণা দেয়। এই গ্রুপটিকে ২০১২-১৩ সালের সংগঠিত দাঙ্গাগুলোর মূল উসকানিদাতা মনে করা হয়। ২০০৭ সালে মায়ানমারে স্যাফর্ন রেভল্যুশনের মাধ্যমে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সামরিক জান্তাকে চ্যালেঞ্জ করছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তারা এখন গতিপথ পরিবর্তন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলনে রত।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া : United Nations Organization রোহিঙ্গাদেরকে 'বন্ধুহীন' একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করে এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছে।

The Clinton Foundation : আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ২০১২ সালে হঠাৎ করেই Clinton Foundation-এর উদ্যোগে মায়ানমার সফর করেন। তিনি ১৪ নভেম্বর Myanmar Peace Centre-এ একটি ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বার্মার থেইন সেইন সরকারকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বন্ধ করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। ক্লিনটন তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, 'The whole world cheers every piece of good news and is sick every time they read about sectarian violence.' বিল ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন, হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ্সের স্পিকার Shwe Mann (শুম্যান) এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী অং সান সু চির সাথে দেখা করে সমস্যাটি সমাধানের উপর জোর দেন। ক্লিনটনের সফরটি কয়েকটি কারণে গুরুত্ব বহন করে।

প্রথমত, ১৯৯৩-২০০১ সাল পর্যন্ত ক্লিনটন ক্ষমতায় থাকাকালীন মায়ানমারের উপর অবরোধ আরোপ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, ক্লিনটনের সফরকালীন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণী প্রধান Catherine Asthon-এর নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি ডেলিগেশন সে সময়ে বার্মা সফর করেছিলেন।

তৃতীয়ত, একই সময়ে OIC সেক্রেটারি জেনারেল একমেলেদ্দীন ইহসানগলের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুর্কি, সৌদি আরব, মিশর, জিবুতি এবং বাংলাদেশের একদল প্রতিনিধি বার্মা সফর করেন। OIC মায়ানমারে তাদের একটি পর্যবেক্ষণ অফিস খোলার অনুমতি চাইলেও থেইন সরকার তা দেয়নি। তবে মায়ানমার সরকার একটি সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন।

www.waytojannah.com

Organization Islamic Conference : OIC বার্মার মুসলমান বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের অবস্থা অবলোকন করেছে। যদি বার্মা সরকার এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করে তা হলে OIC জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বানের নোটিশ দেবে এবং বিষয়টি জাতিসংঘে উথাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

The Elders : বিশ্বের সম্মানিত সিনিয়র নাগরিকদের সংগঠন 'The Elders.' আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এর সভাপতি এবং এর সহসভাপতি (Deputy Chair) হচ্ছেন নরওয়ের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গ্রো হার্লেম ব্রান্টল্যান্ড। তারা উভয়ে মায়ানমারের মুসলমানদের উপর সরকার ও উগ্র বৌদ্ধদের অব্যাহত আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে তা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। AFP ২৭-০৯-২০১৩ তারিখে রেঙ্গুন থেকে 'The Elders'-এর যে বিবৃতিটি প্রচার করে তা নিম্নরূপ : 'The Elders call an end to impunity for the prepetrators of violence against the Muslims community and for the meaningful realisation of the right of freedom at religion.' Co-Chair Ero Harlem বলেন, 'No-one can afford to ignore these senseless, distructive, repeated acts of brutality.'

নোবেল ল'রিয়েট মনীষীবৃন্দ : শান্তিতে নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত মনীষীগণও রোহিঙ্গা ও মুসলমানদের উপর হামলা ও জাতিগত নির্মূল অভিযান বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের ড. ইউনূস, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা এবং ডেসমন্ড টুটো। নেলসন ম্যান্ডেলা ২০০৭ সালে মায়ানমারে মুসলিম গণহত্যা বন্ধে বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ডেসমন্ড টুটো এক খোলা চিঠিতে বিশ্ববাসীকে মায়ানমারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় ও মুসলিমদের উপর নির্যাতন বন্ধের জন্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডেসমন্ড টুটো বলেন, তিনি লক্ষ করেছেন যে, প্রতিনিয়ত মুসলিমদেরকে উপহাস করার জন্য বৌদ্ধগণ মুসলমানদেরকে 'কুলার' বা নীচ লোক হিসেবে অভিহিত করে। কোনো কোনো জায়গায় এদেরকে 'কল্লা' বা বহিরাগত হিসেবে সম্বোধন করা হয়।

বিবৃতিতে তারা মায়ানমার সরকারকে ১৯৮২ সালের Citizenship act বাতিলের দাবি জানান। সাথে সাথে অতিসম্প্রতি মিয়ানমার সরকারের সন্তান ধারণ সম্পর্কিত যে আইন অর্থাৎ কোনো মুসলমান দুজনের বেশি সন্তান জন্ম দিতে পারবে না—এই অমানবিক আইনও বাতিলের দাবি জানান। উল্লেখ্য, মিয়ানমার সরকার সম্প্রতি মুসলমানদের উপর জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেছে। এর মাধ্যমে ২ জনের বেশি সন্তান নেয়া নিষিদ্ধ এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরাকানে বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন ২টি শহর বুথিডং ও মুয়াভা। এ দু'শহরে ৯৫% মুসলমান। এ দু'শহরে কড়াকড়িভাবে এ আইন প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমগ্র মায়ানমার এবং বিশেষভাবে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানগণ অমানবিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। হত্যা, গুম, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাকার মানবতাবিরোধী অপরাধ মায়ানমার সরকারের সহায়তায় নৈমত্তিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। জ্বালাও-পোড়াও, ধর্ষণ, হত্যা, গুম ইত্যাকার মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহের বর্ণনার জন্য পৃথিবীর সব অভিধানের যেসব শব্দমালা আছে, তার সবগুলো একত্র করে বিবরণ লিপিবদ্ধ

www.waytojannah.com

করলেও মায়ানমারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধসমূহের বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না। তবে লক্ষণীয় যে, ইতোমধ্যে বিশ্ববিবেক জাগতে শুরু করেছে। আশা করা যায়—এর একটি সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে আসবে।

১৯৯৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পাওয়া জার্মান সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাসের কবিতার ভাষায় বলা যায়,

‘And I hope too that many be freed
From their silence, may demand
That those responsible for the open danger.’

(আর আমি এও আশা করি অনেকেই মুক্ত হবে, নীরবতার শিকল ছিঁড়ে দাঁড়িয়ে যাবে—এই দাবি নিয়ে ওই উন্মুক্ত বিপদের দায়ভার কেবল ওদেরই তো।)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। (ক) বার্মা বা মায়ানমারের পরিচয় দাও।
(খ) আরাকান রাজ্যের পরিচয় দাও।

২। (ক) রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তির বিবরণ দাও।
(খ) মায়ানমারের মুসলিম নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর নাম লেখ।

৩। (ক) আরাকানের প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ দাও।
(খ) চট্টগ্রামের সাথে আরাকানদের যোগাযোগের ঐতিহাসিক সূত্রটি আলোচনা কর।

৪। (ক) ৯৬৯ গ্রুপ কী?
(খ) Rakhaine Nationalist Development Party-র পরিচয় দাও।

৫। (ক) মুসলিম জাতিসত্তা নির্মূল করার জন্য বার্মা সরকার কর্তৃক পরিচালিত চারটি কম্বিং অপারেশনের নাম লিখ।
(খ) সংঘটিত দাঙ্গার সাল উল্লেখ করে ৪টি মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বার্মায় মুসলমানদের আগমনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্যভিত্তিক বিবরণ দাও।

২। বার্মা সরকার কর্তৃক মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নিবর্তন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। বিভিন্ন সংগঠনের উসকানিতে বার্মায় সংঘটিত মুসলিম বিরোধী দাঙ্গাসমূহের বিবরণ দাও। এতে বার্মা সরকারের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ কর।

৪। মুসলিম জাতিসত্তা নির্মূলে বার্মা সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও মনীষীদের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা কর।

www.waytojannah.com

অষ্টম অধ্যায়

জাপান : দূর প্রাচ্যে ইসলামের আগমন মুসলিম বিকাশধারা ও বর্তমান অবস্থা

জাপান সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন দেশ। চতুর্দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত অনেকগুলো দ্বীপপুঞ্জের সমাহারে গঠিত জাপান রাষ্ট্রটি পূর্ব এশিয়ার একটি বিস্ময়। ১৮৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এটি ছিল বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কহীন একটি বিচ্ছিন্ন দেশ বা Isolated country. যে দেশটিকে আমরা জাপান বলে জানি, জাপানিদের কাছে তার নাম হল 'দাই নিপ্পন' বা 'সূর্যোদয়ের দেশ'। প্রাচীনকাল থেকে জাপানিদের বিশ্বাস যে, সূর্যের প্রথম রশ্মি তাদের দেশে ছোঁয়া লাগায়। এজন্য জাপানের রাজবংশকে সূর্যদেবী থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করা হয়। এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে মহাসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল অতীব জরুরি। তাই প্রাচীনকাল থেকে তারা ছিল দুঃসাহসী নাবিক। কারণ নৌযান এবং জাহাজের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যান্য ভূখণ্ডের সাথে তাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো।

প্রাচীন যুগ থেকে জাপানে তিনটি ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। এগুলো হলো—(ক) শিন্তো ধর্ম, (খ) বৌদ্ধ ধর্ম ও (গ) কনফুসীয় ধর্মমত। জাপানের রক্ষণশীল সম্রাট এবং সেখানকার সমান্তবাদী শাসকশ্রেণী সোগা, ফুজিয়ারা, মিনামাতো, তোকুগাওয়া শোগুন প্রভৃতি যারা সম্রাটের নামে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করত তারা মনে করত যে, ইউরোপীয় ও আমেরিকানদেরকে অবাধ বাণিজ্য সুযোগ দিলে তারা এদেশের জনগণকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলবে এবং তাদের দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। বিশেষ করে আমেরিকানদের অতি উৎসাহ তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। ১৬৩৯ সাল থেকে শুধুমাত্র চীনকে জাপানের নাগাসাকি বন্দর সারা বছরের জন্য এবং পর্তুগিজদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাগাসাকি বন্দরে ঢুকতে দেয়া হতো। ১৮৫৩ সালে কমোডর পেরি জোর করে জাপানের ইয়েদো (টোকিও) বন্দরে ঢুকে পড়েন। ১৮৫৪ সালে তিনি আবার ফিরে এসে জাপানকে চুক্তি সই করতে বাধ্য করেন। তখন থেকে জাপান বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত হয়।

www.waytojannah.com

জাপানে ইসলামের আগমন : আমেরিকান নৌবাহিনীর কর্মকর্তা কমোডর পেরির ১৮৫৩ সালে জাপানের ইয়েদো (টোকিও) বন্দরে ঢুকে পড়ার প্রায় তিনশত বছর (২৯৮ বছর) পূর্বে ১৫৫৫ খ্রি. মালাক্কা দ্বীপ—যা ইতিহাসে Spice island বা মশলার দ্বীপ নামে পরিচিত, সে দ্বীপ থেকে একটি পর্তুগিজ জাহাজ জাপানের নাগাসাকি বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। সে জাহাজে একজন আরব বণিক ছিলেন যিনি জাপানে পৌঁছে সেখানে নেমে পড়েন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে সর্বপ্রথম জাপানিদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছায় এবং স্বল্পসংখ্যক জাপানি নৃগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে (১৮৭০ খ্রি.) কিছু জাপানি নাবিক যারা ব্রিটিশ এবং পর্তুগিজ জাহাজে চাকরি করত, তারা মালয় দ্বীপের মুসলিমদের সংস্পর্শে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম মহানবী (স.)–এর জীবনী জাপানি ভাষায় অনূদিত হয় এবং তারা ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী (স.)–এর জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত হয়।

মুসলিমদের সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ঘটে ১৮৯০ সালে। সে সময়ে জাপানি প্রিন্স কোমাতসু আকিহিতোর কন্সটান্টিনোপল সফরের ফিরতি শুভেচ্ছা হিসেবে তুর্কি সরকার জাপানে 'এরতুঘরুল' নামক একটি নৌবাহিনীর জাহাজ প্রেরণ করেন। এই সুবাদে জাপানিরা মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত জাহাজটি স্বদেশে ফেরার পথে ওকাইয়ামা ডিস্ট্রিকটের সন্নিকটে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়।

জাপানি আদিবাসী প্রথম হাজি : কোটোরো ইয়ামাওকা নামক একজন জাপানি বোম্বেতে অবস্থানকালে একজন রাশিয়ান মুসলিম লেখক আব্দুর রশীদ ইব্রাহীমের সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ওমর ইয়ামাওকা নাম ধারণ করেন। তিনি মূলত রুশ–জাপান যুদ্ধের সময় মাঞ্চুরিয়ায় গোয়েন্দা বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন এবং দেশে ফেরার পথে মক্কায় হজব্রত সম্পাদন করেন। এ সফরে তিনি তুর্কি সুলতানের নিকট থেকে টোকিওতে একটি মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করেন। এরপর বুনপাচিরো আরিগা যিনি ভারতে অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণ করে আহমেদ আরিগা এবং ইয়ামাদা তোজিরো ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণ করে আব্দুল খলিল নাম ধারণ করেন এবং দেশে ফেরার পথে হজ সম্পাদন করেন।

উপরের উল্লিখিত বিষয়গুলো ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এর ফলে জাপানিরা বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামের সাথে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করলেও সামগ্রিকভাবে জাপানে ইসলামের কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি এবং মুসলমানরা জাপানে একটি সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। ইতোমধ্যে মানুষের মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং age of doubt and enquirey অর্থাৎ সন্দেহ ও অনুসন্ধিৎসার যুগের প্রভাবে অর্থনৈতিক সাম্য ও মুক্তির বাণী নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হতে শুরু করে। যার অন্যতম হল Communism বা সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদীরা লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে কমিউনিস্ট বিপ্লব সাধন করে। ধর্মবিরোধী এবং খোদাদ্রোহী এ মতবাদ মধ্য এশিয়ার মুসলিমদের উপর ব্যাপক আঘাত হানে। সে সময়ে অনেক রাশিয়ান মুসলিম মধ্য

www.waytojannah.com

এশিয়া থেকে জাপানে আগমন করে এবং জাপান সরকার তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। এরা জাপানের রাজধানী টোকিও এবং দেশের অন্যান্য শহরগুলোতে বসতি স্থাপন করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদেরকে সংগঠিত করে ইসলামি জীবনবোধ ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে থাকে।

জাপানি মুসলিমদের শ্রেণী বিভাগ : জাপানে মুসলিমদের তিনটি সম্প্রদায়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যথা : (১) সুন্নি, (২) শিয়া ও (৩) আহমাদিয়া। জাপানে সুন্নি মতাবলম্বী মুসলমান হচ্ছে ৯৯%। বাকি ১% হচ্ছে শিয়া ও আহমাদিয়া/কাদিয়ানি। আহমাদিয়াদেরকে সাধারণভাবে মুসলিম হিসেবে স্বীকার করা হয় না, যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে। ১৯৩৫ সালে আহমাদিয়াগণ জাপানে আসে। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমগণ ১৯৬০ সালের দিকে জাপানে আগমন করে এবং জাপানে প্রথম 'আজাদারি' (**Azadari** শিয়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) স্থাপন করে। এদের সংখ্যা খুবই কম এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানের মতো মহররমের ৭ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত সমবেতভাবে অডিও শোনে এবং মহররম উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

জাপানে মুসলিম জনসংখ্যা : জাপানে মুসলমানদের পরিসংখ্যানভিত্তিক সঠিক তথ্য পাওয়া খুবই দুরূহ। কেননা জাপান সরকার ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা নির্ণয় করে না। তবে জাপানের বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও পরিসংখ্যানবিদদের মতে জাপানে প্রায় দুই লক্ষ মুসলমানের বাস। এদের মধ্যে ৬৩,৫৫২ জন হচ্ছে জাপানি আদিবাসী মুসলিম এবং অন্যরা হচ্ছে বহিরাগত মুসলিম যারা জাপানে বসবাস করে। এ ছাড়াও এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হতে অনেক মুসলিম জাপানে শিক্ষা, গবেষণা ও চাকরিতে নিয়োজিত আছে। এ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তারা বলেন, 'The Japanese government does not keep any statistics on the number of Muslims in Japan. Neither foreign residents nor ethnic Japanese are never asked about their religion by official government agencies.'

জাপানে মসজিদের সংখ্যা : মুসলমানেরা পৃথিবীর যে জায়গাতেই থাক না কেন তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে ইবাদতের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা। কেননা ইসলামি শরিয়তে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া আছে। সে হিসেবে জাপানের বিভিন্ন মুসলমানরা ইবাদতের জন্য অনেকগুলো মসজিদ তৈরি করেছে। Japanfocus.org. এর মতে জাপানে ৩০ থেকে ৪০টি একতলাবিশিষ্ট মসজিদ আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মসজিদ হচ্ছে জাপানের কোবে মসজিদ, যার নির্মাণ কাজ ১৯৩৫ সালে সমাপ্ত হয়। এ ছাড়াও রয়েছে টোকিওর জামে মসজিদ এবং টোকিওতে অবস্থিত আহলুল বায়াত ইসলামিক সেন্টার। আহলুল বায়াত ইসলামিক সেন্টার মসজিদের ইমাম হচ্ছেন একজন জাপানি আদিবাসী, যার নাম শেখ ইব্রাহীম সাওয়াদা।

এ ছাড়াও জাপানি মুসলিমদের নামাজ আদায়ের জন্য আরো একশর অধিক নামাজ ঘর রয়েছে। যেখানে তারা নামাজ (সালাত) আদায় করে থাকেন। মসজিদের সবগুলো বৈশিষ্ট্য এগুলোতে না থাকার কারণে এগুলোকে মসজিদ হিসেবে অভিহিত করা হয় না।

www.waytojannah.com

জাপানে মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন ও কার্যক্রম : জাপানে কয়েকটি মুসলিম সংগঠন রয়েছে, যারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন এবং প্রথম সংগঠন হলো 'The greater Japan Muslim League'। এটি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। এ সংগঠনটির প্রচেষ্টায় জাপানে একশটির বেশি ইসলামি বই প্রকাশিত হয়েছে। জাপান সরকার মুসলিম সংগঠনটিকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। সংগঠনটি মুসলিম বিশ্বের সাথে জাপানের সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্কলারদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করত। রাশিয়ার বিপক্ষে মিত্র হিসেবে জাপান সরকার মুসলমানদের সমর্থন পেত এবং এ সংগঠনটি জাপানের greater Asia বা বৃহত্তর এশিয়ান সাম্রাজ্য গঠনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণ করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় এবং অটোমান সুলতানের পরাজয় মুসলিমদের উথানকে বাধাগ্রস্ত করে। মিত্রশক্তি সংগঠনটির নেতা সুমেই ওকাওয়াকে প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বন্দি করে এবং সংগঠনটিকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে propaganda cell বা প্রচার হিসেবে আখ্যায়িত করে এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সুমেই ওকাওয়া কারাবন্দি অবস্থায় জাপানি ভাষায় কোরানের অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং পরে মুক্তি পান।

জাপানের আরেকটি প্রাচীন মুসলিম সংগঠন হলো 'Japan Muslim Association' সাদেক ইমাইজুমি নামক একজন জাপানি মুসলিমের নেতৃত্বে এ সংগঠনটি ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৫ জন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জাপান যখন চীন এবং দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া অভিযান পরিচালনা করে, তখন এ সমস্ত জাপানি সৈন্যরা মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ করে এবং দেশে প্রত্যাগমন করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে এ সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাদেক ইমাইজুমির পরে ওমর মিতা উপরিউক্ত সংগঠনটির দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি জাপান কর্তৃক অধিকৃত চীনের মাঞ্চু রেলওয়ে কোম্পানিতে দায়িত্বরত ছিলেন। মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে তিনি জাপানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হজ সম্পাদন করেন। তিনি জাপানি ভাষায় কোরানের অনুবাদ করেন এবং জাপান মুসলিম এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে জাপানে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। জাপানের মুসলিম সংগঠনগুলো জাপানের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। যার কারণে জাপানের Ajia gikai (আজিয়া গিকাই) নামে একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন শান্তো, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি ইসলামকেও জাপানিদের ধর্ম হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতিদানের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাপানে ইসলামি 'দাওয়াহ' কার্যক্রম : জাপানে মুসলমানদের প্রাচীন সংগঠনগুলো এবং অধুনা অভিবাসী মুসলিম মুসলিম ছাত্ররা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুসলিমদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ সমস্ত সংগঠনগুলো শহরকেন্দ্রিক, যেমন—হিরোশিমা,

www.waytojannah.com

কেয়েটো, নাগোয়া, ওসাকা এবং টোকিওতে অবস্থিত। তবে এখানে ইসলামের প্রচারকার্য পরিচালনায় মুসলিমদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তন্মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, আবাসন সমস্যা, মুসলিম শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা সর্বোপরি হালাল খাবারের সমস্যা প্রকট। তা ছাড়া ইসলামি সাহিত্যেরও ব্যাপক অভাব রয়েছে।

তবে আশা করা যায় যে, জাপানের মুসলিম ভাইয়েরা সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জাপানে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এসব অসুবিধা ভবিষ্যতে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। জাপানের পরিচয় দাও।
২। প্রাচীন যুগে জাপানে কয়টি ধর্মমত ছিল?
৩। জাপানি মুসলিমদের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।
৪। জাপানি মুসলিমদের কয়েকটি প্রধান সংকট সম্পর্কে আলোচনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জাপানি মুসলমানদের আগমন ও ইসলামের প্রসারের প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা কর।
২। জাপানে মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রমের বিবরণ দাও এবং মুসলমানদের সমস্যাসমূহের উপর আলোকপাত কর।

www.waytojannah.com

নবম অধ্যায়

চীনে ইসলামের আগমন : উইঘুর মুসলিম ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়

চীন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য : চীনে ইসলামের আগমন—চীনে ইসলামের বিস্তার—বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়—মুসলমানদের প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধ-১৯৪৯ সালের কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর মুসলমানদের অবস্থা—চীনা মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ—উইঘুরসহ অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের বর্তমান চালচিত্র।

চীনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম একটি বৃহৎ দেশ। ভূ-আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে চীনের অবস্থান চতুর্থ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে প্রথম। চীনের মোট আয়তন ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার ৩৮৬ বর্গমাইল (৯৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৬০ বর্গকিলোমিটার) এবং এর জনসংখ্যা হচ্ছে ১৩১ কোটি ৫৮ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে ৩৬৫ জন লোকের বসবাস। চীনে প্রচলিত ভাষাসমূহ হচ্ছে— মান্দারিন, উ (Wu) ক্যানটোনেসি, সিয়াং (Hsiang), মিন (Min), হাক্কা (Hakka) এবং কান (Kan)। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে চীনাদের অবস্থান নিম্নরূপ—

৫৯% কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না। শতকরা ২০ ভাগ সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শতকরা ৬ ভাগ, মুসলিম শতকরা ২ ভাগ এবং অন্যান্য শতকরা ১৩ ভাগ। জাতিসত্তার বিচারে চীনাদেরকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

হান (Han) ৯২%, উইঘুর, তাজিক ও অন্যান্য ৬ শতাংশ, হুই (Hui) ১ শতাংশ ও হুয়াং (Zhuang) ১ শতাংশ। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় চীন সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে এবং ব্যাপকভাবে শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হয়। বর্তমানে চীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং সামরিক দিক থেকেও অন্যতম একটি শক্তিশালী দেশ। চীনের রয়েছে এক অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং চীনে শুধুমাত্র মুসলমানেরা পৃথক ইসলামি সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক।

www.waytojannah.com

চীনে ইসলামের আগমন : মহানবী (স.)–এর জন্মের পূর্ব থেকেই চীন দেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কার মাধ্যমে আরব ও চীন দেশের মধ্যে ব্যবসা–বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এই সময়ে ট্যাঙ রাজবংশের শাসনামলে (৬১৮–৯০৭) চীনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আরবদের বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মদিনা এবং আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যাপক সংখ্যক বিদেশী ক্যান্টন নগরীতে আগমন করে। তারা এক আল্লাহর উপাসনা করে। তাদের উপাসনালয়ে কোনো দেব–দেবীর মূর্তি বা প্রতিচ্ছবি নেই। আগন্তুকেরা মদ্যপান করে না, শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না এবং নিজেদের জবেহ করা প্রাণী ব্যতীত অন্য প্রাণীর মাংস অপবিত্র মনে করে স্পর্শ পর্যন্ত করে না। সম্রাটের নিকট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে তারা ক্যান্টনে বসবাস শুরু করে। তারা সকলেই ধনী এবং তাদের সমাজপতিদের নির্দেশ মেনে চলে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, চীন দেশে ইসলামের পরিচিতি ও গোড়াপত্তন আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে হয়েছিল। এসব বণিক প্রাচীন সামুদ্রিক বাণিজ্যপথে চীন দেশে এসেছিলেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য হতে জানা যায় যে, পারস্যদেশের মাধ্যমে আরব ও চীনের মধ্যে স্থলপথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সিল্ক রুটের মাধ্যমে চীন থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বাণিজ্য কাফেলা চলাচল করত। তাই বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আরব বণিকদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এখানে ঐতিহাসিক Arrold-এর উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'The spread of Islam in India and other part of the world is in the quiet unobotrusive labours of the preacher and the trader who have carried their faith into every quarter of the globe.'

চীনা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, চীন দেশে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)–এর এক মামা এবং ক্যান্টনে তার মাজারকে লোকজন অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে।

উমাইয়া আমলকে 'মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বর্ণযুগ' বা golden age of Muslim expansionism বলা হয়ে থাকে। এ সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময় (৭০৫–৭১৫ খ্রি.) এ বিজয় উত্তুঙ্গে ওঠে। তার সময়ে কোতায়রা–বিন–মুসলিমকে খোরাসানের গভর্নর পদে নিয়োগ করা হয়। কোতায়বা ৭০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে সহজেই বলখ, তুখারিস্তান, ফরগানা, খাওয়ারিজম ও সমরকন্দসহ আরো বহু শহর বিজয় করেন। অভিযানের শেষের দিকে ৭১৪ খ্রি. কোতায়বা পূর্ব তুর্কিস্তান বিজয় করে কাশগড় পর্যন্ত পৌছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে কোতায়বা চীন সম্রাটের রাজদরবারে একজন দূত পাঠান এবং চীন সম্রাট উক্ত দূতকে প্রচুর উপঢৌকনসহ ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে কোতায়বার মধ্য এশিয়া বিজয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ বিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়ার জড়বাদী মোঙ্গল, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং তুর্কিগণ ইসলামের সংস্পর্শে আসে এবং কালক্রমে মধ্য এশিয়া ইসলামি

www.waytojannah.com

সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কাশগড় বিজয়ের ফলে চীনের অভ্যন্তরে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে আঘাত হানে। চৈনিক ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, ৭২৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হিশাম চীনা দরবারে সোলায়মান নামক এক ব্যক্তিকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিকে চীন সম্রাট সুয়াং টুংয়ের শাসনামলে আরব ও চীনদেশের মধ্যে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। সে সময়ে সম্রাট সুয়াং টুং এক অবৈধ দখলদার কর্তৃক সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ হন এবং তার ছেলে সু–সাংয়ের পক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন (৭৫৬ খ্রি.)। নতুন সম্রাট সু–সাং সিংহাসনে আরোহণ করে আব্বাসীয় খলিফা আল–মনসুরের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সম্রাটের সাহায্যার্থে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাদের সহায়তায় বিদ্রোহীদের দখলে থাকা সি–নাগানফু ও হু–নানফু নামক শহর দুটি উদ্ধার করতে সমর্থ হন। এই সেনাবাহিনী আর স্বদেশে ফেরত যায়নি। এরা ক্যান্টনে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু ক্যান্টনের শাসনকর্তা তাদের জোরপূর্বক ক্যান্টন থেকে বহিষ্কার করতে চাইলে পূর্ব থেকেই ক্যান্টনে অবস্থানরত মুসলিম ও পার্শি বণিকদের সহায়তায় তারা বিদ্রোহ করে এবং ক্যান্টনের কেন্দ্রস্থল দখল করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ক্যান্টনের শাসনকর্তা নগর প্রাচীরের অন্তরালে গিয়ে কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করেন। পরে তিনি চীনা সম্রাট থেকে আরব সৈন্যদের চীন দেশে বসবাসের অনুমতি লাভ করে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেন। এসব সৈন্যরা সরকারিভাবে বাড়ি বরাদ্দ পায় এবং চৈনিক রমণীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চীনের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়।

চীনা রাজাদের দরবারে অনেক মুসলিম গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৪৪ সালে চীনের রাজকোষ ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন আব্দুর রহমান নামক জনৈক মুসলিম। ১২৫৯ সালে কুবলাই খাঁ চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার মুদ্রা ও অর্থনীতি বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব দেন বোখারার অধিবাসী ওমর শামসুদ্দীনকে। তিনি সৈয়দ আজল নামে সমধিক পরিচিত। একজন সুদক্ষ প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর তিনি ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। চীনদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সৈয়দ আজলের উত্তরাধিকারীদের ব্যাপক অবদান ছিল। তার পৌত্র ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'সত্য ও পবিত্র ধর্ম' হিসেবে সম্রাটের নিকট হতে ইসলাম ধর্মের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৈয়দ আজলের অপর উত্তরাধিকারী সম্রাটের অনুমতিক্রমে সি–নগান–ফু ও নান কিং–এর প্রধান নগরীতে অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

বিশ্বের বিখ্যাত পরিব্রাজকদের অনেকে চীন ভ্রমণ করেছেন এবং তাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে চীনে মুসলমানদের উপস্থিতির কথা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলো ১২২৫ থেকে ১২৯২ খিস্টাব্দ পর্যন্ত চীনের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন এবং তার ভ্রমণবৃত্তান্তে ইউনান প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের বসবাসের কথা উল্লেখ আছে। অপর এক ঐতিহাসিক বলেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউনান প্রদেশের রাজধানী 'তালিফুর' অধিবাসীরা সবাই মুসলমান ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা চীনের উপকূলবর্তী সকল নগরী ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে তিনি

www.waytojannah.com

সর্বত্র তার দ্বীনিভাই মুসলমানদের থেকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

১৬৪৪ খ্রি. মাঞ্চু রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর কাম–সু প্রদেশে মুসলমানেরা একবার বিদ্রোহ করেছিল। পরে সেটি প্রশমিত করা হয়। ১৭৩১ সালে সম্রাট ইয়েন চেনের রাজত্বকালের এক ফরমানে চীন সম্রাট ও মুসলমানদের মধ্যে সু–সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্রাট ইয়েন চেনের ত্রিশ বছর পর তার এক উত্তরাধিকারী কিয়েন–লং খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের প্রতি সমর্থন ও আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। সম্রাট কিয়েন–লং তার সাম্রাজ্যের উত্তর–পশ্চিমে অবস্থিত কাশগড় বিদ্রোহ দমনের জন্য দুইজন তুর্কিবেগকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য পিকিংয়ে দুটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তারা কাশগড়ের বিদ্রোহ দমন করে কয়েক হাজার যুদ্ধবন্দিকে নিয়ে এসেছিলেন। সম্রাট এসব বন্দিদের নামাজ আদায়ের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এসব যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে এক পরমা সুন্দরী মহিলাকে সম্রাট তার রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার প্রতি অনুরাগের নিদর্শন হিসেবে তিনি রাজপ্রাসাদের বিপরীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই মহিলা মসজিদের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে তার স্বদেশী বন্দিদের নামাজ আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করতেন এবং নিজেও নামাজ আদায় করতেন।

মোঙ্গলদের চীন দখলের পর এবং মধ্য এশিয়া বিজয়ের পর অনেক মুসলিম চীনে প্রবেশ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার অনেক উত্তরাধিকারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল ইমানদার শাসকদের মধ্যে রয়েছেন গাজান খান, উলজায়তু ও ভাগ্যবান সুলতান আবু সাঈদ বাহাদুরসহ অনেকে। এরা সকলে ইসলামের অপার শান্তি ও সম্মানসহ পরলোক গমন করেছেন। ১৭৭০ সালে চীনের জাঙ্গুরিয়ায় এক মুসলিম বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহ দমনের পর সম্রাট কিয়েন লিং চীনের অন্য অঞ্চল থেকে দশ হাজার সামরিক লোককে জাঙ্গুরিয়ায় অভিবাসিত করেন। কিন্তু এরা সবাই তাদের মুসলমান প্রতিবেশীর সংস্পর্শে এসে তাদের উন্নত জীবনাচার দেখে অভিভূত হয় এবং সকলে মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে দেখা যায় যে চীনে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সংঘটিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, সব চীনা সম্রাটের সময়ে চীনে মুসলমানদের গতিধারা নির্বিঘ্ন ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৮৫৫ হতে ১৮৭৩ সময়কাল পর্যন্ত ইউনান প্রদেশের প্রান্তে বিদ্রোহের পর ব্যাপক হারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ হয় এবং ১৮৬৪–৭৭ ও ১৮৯৫–১৮৯৬ সালে যথাক্রমে সেন–সি এবং কানসুর তুঘান বিদ্রোহের কারণে চীনা মুসলিম জনসংখ্যা দশ লক্ষাধিক হ্রাস পায়। তবুও বলা যায় যে, ইসলামি জীবনাদর্শের সঞ্জীবনী ধারা এখনো চীনা মুসলমানদের অন্তরে প্রবাহমান এবং তা নীরবে হলেও বয়ে চলছে।

জিনজিয়াংয়ের উইঘুরসহ অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় : জিনজিয়াং হচ্ছে চীনের সুদূর পশ্চিম এবং উত্তর–পশ্চিম এবং মুসলিম বিশ্বের প্রাচ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত চীনের অন্তর্গত উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত একটি প্রদেশ। এটির প্রাচীন নাম পূর্ব তুর্কিস্তান। বর্তমানে চীন সরকার এর নাম দিয়েছে Xinjiang Uyghur Zizhiqu (জিনজিয়াং উইঘুর জিজিকু)।

www.waytojannah.com

'জিজিকু' একটি চায়না শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে Autonomous reign বা স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। চীনে এরকম পাঁচটি 'জিজিকু' বা স্বায়ত্তশাসিত এলাকা রয়েছে। তন্মধ্যে 'জিনজিয়াং' একটি। চীনে দশটির মতো মুসলিম জাতিসত্তা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—(১) ইউঘুর (Uyghur), (২) হুই (Hui), (৩) হাসাকে (Hasake), (৪) সালার (Salar), (৫) তাজিকে, (৬) উজবেক (Ugbek), (৭) কিয়ারকেজি (Keerkegi) ও অন্যান্য। চীনে প্রায় তিন কোটির মতো মুসলমান রয়েছে, যদিও সরকারিভাবে এ সংখ্যা অনেক কম দেখানো হয়। চীনে প্রায় ৩০,০০০ মসজিদ রয়েছে, তন্মধ্যে ২৩,০০০ মসজিদ জিনজিয়াং প্রদেশে অবস্থিত।

উইঘুরদের সোনালি অতীত ও সংগ্রামমুখর জীবন : উইঘুর মুসলিমরা হচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তানের অধিবাসী। চীনা সরকার এটাকে দখল করে নেয়ার পর এর নাম দেয় জিনজিয়াং। এটাকে অশুভ ভেবে চীনের জিনজিয়াং বা New-frontier নাম দেয়া হয়েছে। এই জাতি গোষ্ঠীটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কাজাখাস্তান, কিরঘিজিস্তান, উজবেকিস্তান ও জিনজিয়াংসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা হবে এক কোটির মতো। এই রাজ্যহীন গোষ্ঠীর ছিল এক সোনালি অতীত। অষ্টম শতকে এদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য কাস্পিয়ান সাগর থেকে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল ঐতিহাসিক সিল্ক রুট। ফলে বিশ্ববাণিজ্যের একটা অংশের উপর তাদের সহজ নিয়ন্ত্রণ ছিল। সপ্তদশ শতকে চীনা হানরা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এরপরই শুরু হয় উইঘুরদের প্রতিরোধ। ১৮৬৪ সালে তারা চীনা হানদের তাড়িয়ে ওই অঞ্চলে কাশগরিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তুরস্কের ওসমানীয় (অটোমান) শাসকেরা তাদের স্বীকৃতি দেন। রাশিয়া এবং ব্রিটেনও কাশগরিয়া রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি ব্রিটেন কাশগড়ে একটি কূটনৈতিক মিশনও স্থাপন করে। রাশিয়ার জাররা ওই অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করবে এই অজুহাতে ১৮৭৬ সালে চীনারা কাশগড়ে অভিযান চালায়। সাথে সাথে ব্রিটেন তার অবস্থান পরিবর্তন করে চীনাদের সমর্থন জানায়। ফলে উইঘুর রাষ্ট্রের পতন ঘটে এবং চীনারা পূর্ব তুর্কিস্তানের নাম বদলে নতুন নাম রাখে জিনজিয়াং। বর্তমানে জিনজিয়াং উইঘুর জিজিকু।

১৯২১ সালে USSR (Union of Soviet Socialist Russia) বা সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপ্লবী উইঘুর ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্ট্যালিনের বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন মলিন হয়ে যাওয়ার পর ১৯২৬ সালে তারা উইঘুরদের পরিত্যাগ করে। তবে উইঘুর বিপ্লবীরা তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। স্বাধীনতাকামী উইঘুররা ১৯৩৩ এবং ১৯৪৪ সালে দুটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৯ সালে উইঘুর বিপ্লবী নেতারা মাওয়ের পিপল্স রিপাবলিক অব চায়নার সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করতে সম্মত হন। চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উইঘুর নেতারা একটি চীনা প্লেনে বেইজিং যাওয়ার পথে এক রহস্যজনক কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং বিপ্লবী সব নেতা প্রাণ হারান। এ ঘটনার পরপরই চীনা সেনাবাহিনী জিজিকু বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে হামলা চালিয়ে উইঘুরদের পদানত করে। একদশক পর প্রতিরোধে বহ্নিমান উইঘুররা নির্বাসনে চলে যায়।

www.waytojannah.com

নব্বইয়ের দশকে আবার গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়। পশ্চিমা বিশ্বের পরাশক্তিগুলো যারা ইরাক, ইরান ও চীনে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় তারা উইঘুরদের ঐক্যবদ্ধ করে এতে ইন্ধন জোগায়। মিউনিখকেন্দ্রিক The World Uyghur Congress (দি ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস) এবং উইঘুর আমেরিকান এসোসিয়েশন (UAA) যৌথভাবে এ কাজে নামে। এতে অর্থ জোগান দেয় আমেরিকার সাহায্যে পরিচালিত ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্র্যাসি (National Endowment for Democracy বা NED)। বর্তমান অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার জন্য চীন ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস নেত্রী রাবিয়া কাদিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, যাকে আমেরিকান সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ 'Apstle of Freedom' বলে অভিনন্দিত করেছিল (Apstle হচ্ছে যিশু তার বাণী প্রচারের জন্য যে ১২ জন শিষ্যকে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের একজন)। চীন মনে করে যে, এসব খেলা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত নয় বরং চীনকে অস্থিতিশীল করার জন্যই করা হচ্ছে। আমেরিকা তার গুয়ানতানামো কারাগার থেকে উইঘুর বন্দিদেরকে ছেড়ে দিয়েছে এবং চীন তাদেরকে আল-কায়েদার সদস্য হিসেবে দাবি করে চীনের কাছে ফেরত দেয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে আমেরিকা কমিউনিস্টদেরকে শায়েস্তা করার জন্য ওসামা-বিন-লাদেনের নেতৃত্বে আল-কায়েদা সৃষ্টি করেছিল সেই জুজুর ভয় দেখিয়ে একসময় আমেরিকা মুসলিমদের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হয়। আবার সুযোগ বুঝে কমিউনিস্ট দেশগুলোও মুসলমানদেরকে দমন করার জন্য একই অজুহাত খাড়া করে। মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপে চীন-রাশিয়া 'শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রু'—সুতরাং এ যুদ্ধে মৌনতা অবলম্বন করো—এ নীতিতে বিশ্বাসী। কারণ এক্ষেত্রে মুসলমান এবং আল-কায়েদা ও আমেরিকা উভয়েই তাদের সাধারণ শত্রু। ১৯৩০ সালের দিকে আমেরিকাও একই নীতি অবলম্বন করেছিল। তখন ইউরোপে ফ্যাসিস্ট গ্রুপ এবং কমিউনিস্টরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত। তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যানের জনপ্রিয় সরস মন্তব্যটি ছিল এরকম—'যদি দেখি জার্মানি জয়ী হচ্ছে তবে আমরা রাশিয়াকে সাহায্য করব—যদি তার উল্টো হয় তবে জার্মানিকে সাহায্য করব—এই ধারায় যতটা পারা যায় তাদের হত্যা কর, যদিও আমি চাই না যে কোনো পরিস্থিতিতে জার্মান বিজয় লাভ করুক'—মনে হয় উইঘুরদের ভাগ্য নিয়ে তেমনি 'গ্রেট গেইম' চলছে। তা না হলে ১৮৭৬ সালে ব্রিটেন যদি উইঘুরদের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার না করত, তা হলে আজকে আমরা একটি জিনজিয়াং উইঘুর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে পেতাম। তবে উইঘুররা একটি স্বাধীনতা প্রিয় স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী এক সাহসী জাতি। তাদের এই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত কোনো সুফল বয়ে আনবে কি না সময় তা বলে দিবে।

ইতোমধ্যেই উইঘুরা তাদের স্বদেশ ভূমি সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। চীন সরকার হানদেরকে ব্যাপকভাবে জিনজিয়াংয়ের উরুমচি এবং কাশগড়ে অভিবাসিত করছে। সাম্প্রতিক সময়ে জিনজিয়াংয়ে হানদের সংখ্যা ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং রাজধানী উরুমচি ও কাশগড়ে হানদের সংখ্যা ৭০% এ পৌঁছেছে। মাঝে মধ্যেই সেখানে দাঙ্গা শুরু হয় এবং এতে বন্ধুহীন উইঘুররা বেঘোরে প্রাণ হারায়। ২০০৯ সালে উরুমচিতে এক দাঙ্গায় ১৮০

www.waytojannah.com

জন নিহত হয়। ২০০৭ সালে তিব্বতে এক দাঙ্গায় ১৯ জন মুসলিম প্রাণ হারায়। তবে দাঙ্গার সংখ্যা এবং নিহতের সংখ্যা প্রকৃত অর্থে কখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। কারণ কমিউনিজমের Iron cartain বা লৌহ–যবনিকা ভেদ করে খবর বের করা খুবই দুষ্কর।

১৯৪৯ সালের কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর চীনের মুসলমান তথা উইঘুর ও হুইদের অবস্থা : কমিউনিজম একটি মানব রচিত মতবাদ। এর প্রবক্তারা হলেন মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেল প্রমুখ মনীষীগণ। এ মতবাদের আদর্শিক রূপকার হলেন রাশিয়ায় লেনিন এবং চীনে মাও সেতুং (মাও–জে–ডং)।

এ মতবাদ ধর্মকে মানে না এবং ধর্মকে তারা 'আফিম'–এর সাথে তুলনা করে। যেহেতু তারা ধর্ম মানে না সেহেতু ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি–নিষেধ তারা তোয়াক্কা করে না। যেহেতু ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম এবং মুসলমানেরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি অনুশাসন মেনে চলে সেহেতু কমিউনিস্টদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ প্রথম থেকেই শুরু হয়। তাই চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর ইসলামি অনুশাসন থেকে মুসলমানদের বিরত রাখার জন্য তারা বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করে। যেহেতু চীনের পশ্চিম এবং উত্তর–পশ্চিম সীমান্তে জিনজিয়াং এবং ইউনানসহ ইউঘুর এবং হুই মুসলিমদের বসবাস সেহেতু সেখানে এসমস্ত বিধি–নিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু উইঘুর মুসলিমগণ ইসলামি শরিয়ার কঠোর অনুসারী এবং জিনজিয়াংয়ের স্বাধীনতার দাবিদার সুতরাং উইঘুরদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেখানে বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রচলন করে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি বিধি–নিষেধের উদাহরণ দেয়া হলো :

(ক) চীনে মসজিদের মিনার থেকে লাউড স্পিকার (মাইক) দিয়ে আজান দেয়া নিষিদ্ধ। তাই নামাজের ওয়াক্ত হলে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আজান দিয়ে নামাজের আহ্বান জানানো হয়।

(খ) চায়না সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Chinese Islamic Association-এর অনুমোদন ব্যতিরেকে মসজিদে নামাজ পড়তে দেয়া হয় না। কোনো কোনো স্থানে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য ৩০ মিনিট সময় দেয়া হয়। খোতবা লিখিতভাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। কোনো ইমাম এটা অমান্য করলে জেল দেয়া হয়।

(গ) কোরান শিক্ষা অথবা আরবি শিক্ষা সরকারের অনুমোদন ছাড়া পরিচালনা করা যায় না।

(ঘ) বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(ঙ) সরকারি অনুমোদন ছাড়া কেউ হজে যেতে পারে না। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে স্বল্পসংখ্যককে যেতে দেয়া হয়।

(চ) সরকারি কর্মচারীদের মসজিদে যেতে দেয়া হয় না। যদি কেউ যায় এবং ধরা পড়ে তা হলে চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়তে হয়।

(ছ) ভালো চাকরি পেতে হলে ধর্ম ত্যাগ করতে হয় অথবা প্রকাশ্যে ধর্ম পালন করবে না এমন ঘোষণা দিতে হয়।

www.waytojannah.com

(জ) রমজানের সময় স্কুল খোলা রাখা হয় এবং মুসলিম ছাত্রদের জোর করে রেস্টুরেন্টে খেতে বাধ্য করা হয়।

(ঝ) স্থানীয় ভাষায় কোরানের অনুবাদ ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়। তবে নিনজিয়াং, কিংহাই এবং গাংসু এলাকায় বসবাসকারী 'হুই' মুসলমানদের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা লক্ষ করা যায়। তারা মুসলমান নাম রাখতে পারে। আরবি ভাষায় একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে পারে। সেখানে মেয়েরা বোরকা পরে, পুরুষেরা দাড়ি রাখতে পারে। মুসলিম রেস্টুরেন্টের মালিক শূকরের মাংস, মদ ইত্যাদি বিক্রি থেকে বিরত থাকতে পারে। এখানে চীনা সরকারকে কিছুটা নমনীয় দেখা যায়। কারণ 'হুই' মুসলিমরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে না।

চায়না মুসলিমদের উৎসবসমূহ : চীনা মুসলিমরা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালন করে থাকে। এগুলোর মধ্যে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা গুরুত্বসহকারে পালন করা হয়। কোরবানির ঈদে গরু, ভেড়া প্রভৃতি জবেহ করা হয় এবং গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

তাজিক, হাসাকে, উজবেক এবং কিয়ারকেজিগণ ছুটির দিনে ঘোড়দৌড়, কুস্তি এবং ভেড়া শিকারের মতো উৎসবগুলো পালন করে সময় কাটায়।

হাসাকে জাতি 'girl chasing game' খেলে থাকে। ছেলে ও মেয়ে এই দৌড়ে অংশ নেয়, পরে পছন্দ হলে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে তারা একটু শান্তির পরশ খুঁজে পেতে চায়।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত : রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন যে, উইঘুরদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া খুবই কঠিন। কারণ সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আমেরিকা অথবা ইউরোপীয় শক্তিবর্গ প্রকাশ্যে অবস্থান নিবে না। বরঞ্চ উইঘুরদের দাবার চাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদেরকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এরচেয়ে যদি তারা আন্তরিকভাবে উইঘুরদের মঙ্গল কামনা করে তা হলে তাদের মানবিক মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত। যেহেতু এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা সেহেতু স্বায়ত্তশাসনের বিষয়গুলো যথাযথভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা উচিত। এ কাজগুলো সম্পাদনে জাতিসংঘের ইউনেস্কো এবং ইউনিসেফ ও মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। তা হলে একটি ঐতিহাসিক জাতি তার স্বকীয়তা রক্ষা করে অগ্রগতির দিকে নিরাপত্তার সাথে এগিয়ে যেতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। (ক) চীনের আয়তন কত? চীনে প্রচলিত ভাষাসমূহ কী কী?

(খ) ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে চীনাদের শতকরা হার কত?

www.waytojannah.com

২। (ক) জাতিসত্তার বিচারে চীনাদের কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়?
(খ) ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর চীনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানত কী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়?
৩। (ক) কোন রাজার শাসনামলে চীনা ইতিহাসে মুসলমানদের সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়?
(খ) সেখানে মুসলিমদের সম্পর্কে কী বর্ণনা দেয়া হয়েছে?
৪। (ক) কাদের মাধ্যমে চীনে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে?
(খ) এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Havell-এর উক্তিটি আলোচনা কর।
৫। (ক) খলিফা প্রথম আল–ওয়ালিদের শাসনামলে মধ্য এশিয়ার দিকে মুসলিম সাম্রাজ্য কতটুকু সম্প্রসারিত হয়েছিল?
(খ) মধ্য এশিয়ার বিজয়ের প্রাথমিক ফলাফল কী ছিল?
৬। (ক) ইউঘুরদের পরিচয় দাও।
(খ) 'জিনজিয়াং উইঘুর জিজিকু' বলতে কী বুঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চীনে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।
২। বিশ্বের বিখ্যাত পরিব্রাজকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে চীনের মুসলমানদের যে বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে তা আলোচনা কর।
৩। প্রাথমিক পর্যায়ে চীনা শাসকদের সাথে মুসলিম খলিফাদের সম্পর্কের উপর আলোকপাত কর।
৪। একটি স্বাধীন উইঘুর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে উইঘুর মুসলিমদের সংগ্রাম ও আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫। ১৯৪৯ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর চীনা মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও।
৬। বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ উইঘুর মুসলিমদের বর্তমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছেন তা বিশ্লেষণ কর।

www.waytojannah.com

দশম অধ্যায়

War on terrorism বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা ও টাওয়ার দুটি ধ্বংসের ঘটনা আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়। ওইদিন সন্ত্রাসীরা চারটি যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করে। যার মধ্যে দুটি টুইন টাওয়ারে আঘাত হানে অপর একটি পেন্টাগনের সদর দপ্তরের একাংশে আঘাত হানে। অপরটি হোয়াইট হাউসে আঘাত হানার পথে আমেরিকার বিমান বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। যার ফলে হোয়াইট হাউস ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে লক্ষ করে যে, আমেরিকার গর্বের প্রতীক টুইন টাওয়ার কী অসহায়ভাবে সবার চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে ধসে যায়। সন্ত্রাসী এ হামলা আমেরিকার গৌরব ও মর্যাদায় মারাত্মক আঘাত হানে। আমেরিকার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তৎকালীন সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

টুইন টাওয়ারে হামলার পরপরই আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ টিভিতে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি এ হামলার জন্য আল-কায়েদাসহ অন্যান্য মুসলিম সশস্ত্র গ্রুপকে দায়ী করেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করেন। অবশ্য পরে তিনি এটাকে ভুল শব্দ হিসেবে অভিহিত করেন এবং 'war' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং War against terrorism বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে এটাতেও পরিবর্তন আনা হয় এবং 'War on terrorism' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 'War Against' এবং 'War on'-এর মধ্যে তাৎপর্যগতভাবে পার্থক্য রয়েছে। 'War Against' হলো সরাসরি শত্রুর বিরুদ্ধে আর 'War on' হলো সম্ভাব্য বা অনুমানভিত্তিক বা সন্দেহবশত শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা। 'War on terror'-এর মাধ্যমে আক্রমণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যদি আমেরিকা মনে করে কোনো দেশ বা কোনো গ্রুপ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, সেটা সঠিক না হলেও সে ঐ দেশ বা গ্রুপের ওপর হামলা চালাতে পারবে। এটাকে তারা নাম দিয়েছে—'Preamptive Attack' অর্থাৎ শত্রু আক্রমণ করার পূর্বেই তাকে আঘাত হেনে অকার্যকর করে দেয়া।

www.waytojannah.com

প্রেসিডেন্ট বুশ এ যুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতিকে আমেরিকার প্রতি সমর্থন জানানোকে বাধ্যতামূলক করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, 'You are either with me or you are against me' অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধে আমার সাথে আছ তা না হলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে আছ। এখানে আমরা পক্ষেও নেই, বিপক্ষেও নেই, আমরা নিরপেক্ষ এমন কথা বলার সুযোগ নেই (There is no scope to say that we are neutral.)।

২০০১ সালের নাইন–ইলেভেনের হামলা পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ও পররাষ্ট্র নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। আমেরিকা এ আক্রমণের জন্য সরাসরি ওসামা–বিন–লাদেনের নেতৃত্বে পরিচালিত 'আল–কায়েদা' নামীয় সন্ত্রাসী গ্রুপকে দায়ী করে। এ সন্ত্রাসী হামলার অন্যতম নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় খালিদ শেখ মোহাম্মদকে। ২০০৩ সালের ১ মার্চ ৪৮ বছর বয়সী এই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করা হয় ইরাকে আমেরিকার বিধ্বংসী আক্রমণ চালানোর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে। খালিদের সাথে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো চারজন সক্রিয় ছিলেন। তারা হলেন—(১) ওয়ালিদ–বিন–আতাশ, (২) ওমর আল–বালুচি ওরফে আব্দ আল–আজিজ, (৩) রামজি বিনালশিব ও (৪) মোস্তফা আহমেদ আল হাওয়াসাই। এ তালিকায় ইদানীং আরো একজনের নাম সংযুক্ত হয়েছে। তিনি হচ্ছেন আল–কায়েদার শরিয়া কমিটির প্রধান আবু হাফ্স আল–মৌরতানি। তাকে ইরানে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে মৌরতানিয়ায় স্থানান্তর করা হয়। তিনি এখন মৌরতানিয়ায় নজরবন্দি আছেন। বলা হয়ে থাকে যে, আবু হাফ্স মৌরতানি সেই ব্যক্তি যিনি ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ (নাইন–ইলেভেন) আমেরিকায় হামলার মূল পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছিলেন। মূল পরিকল্পনা ছিল আমেরিকার দশটি বিমান ছিনতাই করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও কার্যালয়ে আঘাত হানা হবে। কিন্তু আবু হাফ্স শুধু নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও ভার্জিনিয়ায় পেন্টাগন কার্যালয়ে হামলার অনুমতি দান করেন। ওয়াশিংটনে হামলার বিমানটি ধ্বংস করা হয় এবং বাকি তিনটি বিমান মূল লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম হয়।

আল–কায়েদার এই অভিনব এবং দুঃসাহসী হামলার পর আমেরিকা বিশ্বব্যাপী তার নৌ, বিমান ও সেনা ঘাঁটিসমূহে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করে এবং ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে আল–কায়েদার সাথে সম্পর্কের অভিযোগ তোলে এবং ইরাকের ব্যাপক গণ–বিধ্বংসী অস্ত্র MDW (Mass Destruction Weapons) মজুদ আছে এই মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে ২০০৩ সালের ২২ মার্চ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সামরিক আগ্রাসন পরিচালনা করে ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। অথচ যে দুটি অভিযোগ ইরাকের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা অর্থাৎ ডাহা মিথ্যা। ইরাকের উন্নত মানের তেল সম্পদ গ্রাস করার লক্ষ্যে সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত একটি উন্নত দেশকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা হয়।

আশির দশকে যখন সোভিয়েত রাশিয়া অতর্কিত অভিযান চালিয়ে আফগানিস্তান দখল করে নেয়, তখন সোভিয়েত রাশিয়াকে বিতাড়িত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে সোভিয়েতবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই প্রতিরোধ যুদ্ধে

www.waytojannah.com

ওসামা-বিন-লাদেনসহ একদল আরব তরুণ অংশ নেয়। এ যুদ্ধে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে ওসামা-বিন-লাদেনের নেতৃত্বে আল-কায়েদা জন্ম লাভ করে। আমেরিকা ও পাকিস্তানের সহযোগিতায় আফগানিস্তানে অনেক প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে। এর মধ্যে মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তালেবান বাহিনী, ওসামা-বিন-লাদেনের নেতৃত্বাধীন আল-কায়েদা বাহিনী, গুলবুদ্দীন হেকমাতিয়া ও বুরহানউদ্দীন রাব্বানীর বাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া গণ-প্রতিরোধের মুখে নাকাল হয়ে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আফগানিস্তান ত্যাগ করে। রাশিয়ার আফগানিস্তান ছেড়ে যাবার পর আফগানিস্তানের বিবদমান গ্রুপগুলোর ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তালেবানগণ ক্ষমতা দখল করে এবং আফগানিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়। রাশিয়াকে বিতাড়নের পর ওসামা-বিন-লাদেন আফগানিস্তানে থেকে যান এবং তার বাহিনীর নেটওয়ার্ক বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত করেন। আমেরিকাসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আল-কায়েদা একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আল-কায়েদার সাথে তালেবানদের আদর্শগত মিল ছিল। ১৯৯৬ সালে তালেবানগণ ক্ষমতা দখল করে আফগানিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণার পর সেখানে কঠোর ইসলামি শরিয়া আইন প্রবর্তন করে। বিশেষ করে নারীশিক্ষা, নারীদের চাকরি করা, পর্দাবিহীন চলাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অনেক নারী ও পুরুষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্ট্যাচু ধ্বংস করা হয়। এর মধ্যে আফগানিস্তানের বোহিমিয়ান প্রদেশে পাহাড়ের গায়ে খোদিত বুদ্ধমূর্তি যা বিশ্ব-ঐতিহ্যের খ্যাতিমান ভাস্কর্য—যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বেকার এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ধ্বংস করা হয়। তালেবানদের এ সমস্ত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদ ওঠে। আমেরিকা তালেবানদের ক্ষমতায় অবস্থান সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এবং ন্যাটো মিলে আফগানিস্তানে অভিযান পরিচালনা করে তালেবানদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে। অপরদিকে আমেরিকা ও ন্যাটো মিলে ওসামা-বিন-লাদেনকে গ্রেফতার অথবা ধ্বংস করার জন্য ওসামা-বিন-লাদেনের পার্বত্য ঘাঁটি তারাবোরার পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালায়। কিন্তু তখন ওসামা-বিন-লাদেনকে হত্যা অথবা গ্রেফতার কোনোটাই সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ওসামা তার আস্তানা পরিবর্তন করে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরে আত্মগোপন করে থাকেন। বুশের পর বারাক ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। তার সময়ে ২০১১ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি কন্টিনজেন্ট ওসামার গোপন আস্তানায় হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং গোপনীয়তার সাথে তার লাশ সাগরের তলদেশে অজ্ঞাত স্থানে কবরস্থ করে। অপরদিকে তালেবানগণ ক্ষমতাচ্যুত হলেও ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের গেরিলা অভিযান অব্যাহত রেখেছে। যার ফলে আফগানিস্তানে প্রতিদিন পক্ষে-বিপক্ষের বহু সেনা এবং সাধারণ মানুষ হতাহত হচ্ছে।

তালেবানদের ক্ষমতাচ্যুতির পর আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থনে হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসেন। আফগানিস্তানের জনগণ তাকে বিদেশী প্রভুদের ক্রীড়নক মনে করে। তাই আফগানিস্তানে চোরাগোপ্তা হামলা এবং প্রতিরোধ দিন দিন

www.waytojannah.com

প্রবলতর হচ্ছে। শান্তির লক্ষণ সুদূরপরাহত বলেই মনে হচ্ছে। টানেলের শেষ প্রান্তে কোনো আলোক রেখা দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে না। হয়তো একদিন আফগানদের এ প্রতিরোধ সংগ্রামই তাদের ভাগ্যের ঠিকানা নির্ধারণ করবে।

ইতোমধ্যে ওসামা–বিন–লাদেনের মৃত্যু হলেও তার প্রতিষ্ঠিত আল–কায়েদা বাহিনীর মৃত্যু হয়নি। ১৯৭৯ সালে রাশিয়ার আফগানিস্তান দখল থেকে শুরু করে রাশিয়ান বাহিনীর প্রত্যাগমন অবধি এবং ওসামা–বিন–লাদেনের মৃত্যু পর্যন্ত (২০১১) তিনি ইসলামি বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে আল–কায়েদা বাহিনীকে একটি ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আল–কায়েদার শাখা অথবা আল–কায়েদার অনুসারী বিপ্লবী গ্রুপ তৈরি করতে সক্ষম হন। এসব গ্রুপকে সুনির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের অধীন আল–কায়েদার হাইকমান্ডের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়। ওসামা–বিন–লাদেনের পর বর্তমানে আইমান আল–জাওহিরি সমগ্র বিশ্বে আলে–কায়েদাকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এ গ্রুপটি এতই দক্ষ ও শক্তিশালী যে, এদের ভয়ে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ সব সময় আতঙ্কিত থাকে। সম্প্রতি আইমান আল–জাওয়াহিরি আল–কায়েদার সদস্যদেরকে আমেরিকার অর্থনৈতিক কেন্দ্রসমূহে হামলার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকা অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে বিপুল বিত্ত–বৈভবের মালিক হয়ে তৃতীয় বিশ্বের বিশেষত মুসলিম বিশ্বের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। যদি অর্থনৈতিকভাবে তাকে দুর্বল করে দেয়া যায়, তা হলে তার বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং আমেরিকার অবৈধ ও অনৈতিক মোড়লিপনা বন্ধ করা যাবে।

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা নিয়ে বিতর্ক

যদিও আমেরিকা টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা নিয়ে সারা বিশ্বে মুসলিম সশস্ত্র গ্রুপ ও বিভিন্ন দেশের মুসলিম শাসকদেরকে আল–কায়েদার সাথে সম্পর্কিত থাকার অভিযোগ এনে আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে ও দখলে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু টুইন টাওয়ারের ধ্বংস নিয়ে খোদ আমেরিকাতেই বিভিন্ন ধরনের মতামত পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তারা এ কাজের জন্য খোদ আমেরিকান সরকার ও ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের দিকে আঙুল তুলছে। তাদের মতে টুইন টাওয়ার ধ্বংস আমেরিকান জায়নবাদীদের সুদূরপ্রসারী চক্রান্তেরই একটি অংশ।

টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়া নিয়ে আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জ যারা ছুড়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে 'ওপেন' নামক ক্যালিফোর্নিয়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অন্যতম। যার সদস্যদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি, পিট সিগারসহ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং সন্ত্রাস ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ। তাদের মতে এটি একটি পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিভেন জোন্সের নেতৃত্বাধীন ৭৫ জন বুদ্ধিজীবী অভিযোগ তুলেছেন যে, নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনে হামলা যাত্রীবাহী বিমানের নয়, এটি ভিতর

www.waytojannah.com

থেকে সংঘটিত একটি ঘটনা। নিউইয়র্ক টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষার পর সেখানে ভবন ধসিয়ে দেয়ার বিস্ফোরক ব্যবহারের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। জোন্স বলেন, আফগানিস্তানের গুহায় বসে কিছু লোক এবং ১৯ জন ছিনতাইকারী এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে আমরা মনে করি না। সরকারের এই বিবৃতিকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি। ওপেন প্রশ্ন তুলেছে যে, সারা বিশ্বের মানুষ টিভিতে দেখেছে যে, গলগল করে সাদা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে নিচে দেবে যাচ্ছে টুইন টাওয়ার। তা হলে সাদা ধোঁয়া কেন? ওপেনের দুই বিশেষজ্ঞ কানাডার কারবেল ও ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ফ্রেডি সিম্প্যাকমান বলেছেন, বিস্ফোরকের মধ্যে নিশ্চিতভাবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, কার্বন ও সালফারের মিশ্রণ ছিল। তা না হলে এ পরিমাণ ছাইবিহীন সাদা ধোঁয়ার জন্ম হতে পারে না। তারা বলেন, বিমানের আঘাত একটি অজুহাত। এখানে দূর নিয়ন্ত্রিত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। তারা আরো প্রশ্ন তোলেন যে, টুইন টাওয়ারের সাথে তৃতীয় একটি ভবনও ধসে পড়েছিল। সে ভবনটিতে কোনো বিমান আঘাত করেনি। তা হলে সে ভবনটিও কোনোদিকে কাত না হয়ে সরাসরি নিচে দেবে গিয়েছিল কেন? তা ছাড়া পেন্টাগনে যে হামলা হয়েছে তার কোনো ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়নি এবং হামলাকারীদের ছিন্নভিন্ন দেহ বা বিমানের ধ্বংসাবশেষও দেখানো হয়নি। তাই এ সমস্ত জিজ্ঞাসা টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাকে রহস্যময় করে তুলেছে। এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, বিমানের ব্ল্যাকবক্স, ক্রু ও যাত্রীদের মৃতদেহ পাওয়া গেলে তাদের DNA টেস্টের মাধ্যমে এবং ব্ল্যাকবক্সের তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত অবস্থা জানা যেত, কিন্তু তা করা হচ্ছে না। প্রতিবাদীগণ এক্ষেত্রে আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ৯/১১-এর আগে ১৯৯৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রে আরেকটি বোমা হামলা হয়েছিল। এফবিআই পরিচালক এ হামলার জন্য ওমর আবদেল রহমানের অনুসারী মুহাম্মদ সালেহকে দায়ী করে। পরে প্রমাণিত হয় যে মোসাদ এর সাথে জড়িত। আবার অনেক ভিন্নমতাবলম্বীরা অভিযোগ করেন যে, আমেরিকাতে প্রতি বছর লক্ষাধিক লোক ইসলাম গ্রহণ করছে, যার মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। এ প্রবণতা দূর করার জন্য এমন ভয়ংকর কিছু ঘটাতে হবে যাতে আমেরিকার অমুসলিম জনগণ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে ঘৃণা করে। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন এ ঘটনার নেপথ্য নায়ক কে—তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের 'দি বাল্টিমোরসান' পত্রিকা 'CIA could be behind 11 September terrorist attack' শিরোনামে খবর প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে কানাডার মন্ট্রিল থেকে প্রকাশিত 'দি গেজেট' পত্রিকার ডেভিড গোল্ডস্টেইন টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য বুশকে দায়ী করেছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, 'The ultimate goal of capitalism is imperialism' অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার শেষ পরিণতি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। অর্থাৎ পুঁজিবাদ তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে যেকোনো সময় স্থবির হয়ে পড়তে পারে। তখন সে তার অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব অতিক্রম করার জন্য বিভিন্ন দেশ দখল করে সম্পদ লুট করে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পায়। তাই প্রেসিডেন্ট বুশ আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠার জন্য সম্পদ লুণ্ঠনের পরিকল্পনায় মুসলিম দেশগুলোকে টার্গেট করেন। কারণ এদের রয়েছে

www.waytojannah.com

অফুরন্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ। তাই ৯/১১–এর পরে ইরাক, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি আছে—এ অজুহাতে হামলে পড়েন। যার পরিণতি বিশ্ববাসীর সামনে পরিষ্কার।

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কাকে বা কাদেরকে বলা হবে জাতিসংঘ এ ব্যাপারে এখনো কোনো সর্ববাদীসম্মত কোনো সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই এটা এখন পরাশক্তিধরদের একটি উদ্দেশ্যমূলক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদী দমনে বিশ্ব মোড়লদের আরো কত কারসাজি দেখতে হবে সে অপেক্ষায় সারা বিশ্ব।

সারা বিশ্বে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী গ্রুপ বিস্তৃতির কারণ : আজকের সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী গ্রুপের উত্থান এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিস্তারের জন্য বিশেষজ্ঞগণ মূলত আমেরিকার দ্বৈতনীতিকে দায়ী করে থাকেন। আমেরিকা প্রথমে তার এক নম্বর শত্রুকে চিহ্নিত করে এবং সেই শত্রুর যারা বিরোধী শক্তি তাদের সাথে মিত্রতা করে প্রথম শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য সাহায্য–সহযোগিতা করে। অর্থাৎ শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু। এই নীতিতে তারা তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং প্রথম শত্রুর বিরোধী গ্রুপকে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী করে তোলে। প্রথম শত্রু পরাভূত হলে দ্বিতীয় শত্রুর উপর তারা খড়্গহস্ত হয় এবং সহজে দ্বিতীয় শত্রুকে ধ্বংস করে এলাকাটি দখল করে নেয়। যেমন আমেরিকানদের জাতশত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারা প্রথমে তালেবান, মোল্লা ওমর, গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার এবং আল–কায়েদাসহ বিভিন্ন গ্রুপকে অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে রাশিয়াকে বিতাড়িত করে। রাশিয়াকে বিতাড়নের পর তারা তালেবান ও আল–কায়েদার উপর হামলা চালায় এবং আফগানিস্তান দখল করে নেয়। অনুরূপভাবে তারা প্রথমে সাদ্দামকে দিয়ে কাতার দখল করায় আবার একটি স্বাধীন দেশ দখল করার অভিযোগ এনে ইরাকে অবরোধ করে প্রথমে দুর্বল করে পরে আল–কায়েদার সাথে সম্পর্কের অভিযোগ এনে সরাসরি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। লিবিয়াতেও তারা একই কাজ করে। একই পদ্ধতিতে তারা ইরানের শিয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য 'জুনদুল্লাহ' নামক একটি সশস্ত্র সংগঠনকে সাহায্য করে যাচ্ছে। Seymour Hersh (স্যামুর হের্শ) নামে একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক 'The Newyork' পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এ সমস্ত দ্বৈতনীতির ভয়াবহ পরিণাম হচ্ছে—

প্রথমত, সন্ত্রাসী দলগুলোর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসীরা সামরিক ট্রেনিং এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হয়।

তৃতীয়ত, এসব গ্রুপের কর্মী–নেতারা বিপুল বিত্ত–বৈভবের অধিকারী হয়।

চতুর্থত, এসব সন্ত্রাসী গ্রুপের অনুকরণে আরো সন্ত্রাসী গ্রুপ গড়ে ওঠে এবং সন্ত্রাস দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

পঞ্চমত, সন্ত্রাসীদেরকে সরবরাহকারী অত্যাধুনিক অস্ত্র বিভিন্ন অপরাধীদের হাতে পৌঁছে এবং তারা স্থানীয়ভাবে সমাজে অপরাধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এক নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি–শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

www.waytojannah.com

এভাবে যখন কোনো রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন অস্ত্র বিক্রেতারা গিয়ে সেখানে হাজির হয় এবং রাষ্ট্রের কাছে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় বটে কিন্তু সমাজ, দেশ ও বিশ্ব হতে শান্তি ক্ষীয়মাণ হতে থাকে।

যেহেতু বিশ্বের একমাত্র ক্ষমতাধর অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র আমেরিকা, সেহেতু বিশ্বের শান্তি এবং অশান্তির দায়ভার তার উপরই বর্তাবে। সুতরাং যখন বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা, তাই কৃতিত্বটা অর্জন করার দায়িত্বও তার। তাই দ্বৈতনীতি পরিহার করে সুস্পষ্ট ও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করাটাই সারা বিশ্ব প্রত্যাশা করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। ‘War on Terrorism’ কী?

২। ‘Preamptive attack’ কী?

৩। ‘Two-in-tower’-এ হামলাকারী চারজন পরিকল্পনাকারীর নাম লেখ।

৪। ‘নাইন–ইলেভেন’ আক্রমণের পরে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে কী দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। টুইন টাওয়ারে আক্রমণের বিবরণ দাও। এ হামলার বিষয়ে আমেরিকাসহ বিশ্বে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তা আলোচনা কর।

২। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ ও সন্ত্রাসী হামলা বৃদ্ধির কারণসমূহ উল্লেখ কর।

www.waytojannah.com

একাদশ অধ্যায়

ইউরোপে ইসলাম : মুসলিম সমাজের বিকাশ ধারা ও বর্তমান অবস্থা

এশিয়া ও আফ্রিকার মতো ইউরোপও একটি প্রাচীন মহাদেশ। ইউরোপ এবং এশিয়া একেবারেই প্রতিবেশী। সাধারণত মহাদেশগুলো মহাসাগর দ্বারা বিভাজ্য হলেও ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে রয়েছে স্থল সীমান্ত এবং এখানে কিছু দেশ রয়েছে যেগুলো এশিয়া ও ইউরোপ দুটি মহাদেশব্যাপী বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ তুরস্ক ও রাশিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে ইউরোপ ও এশিয়াকে একত্রে 'ইউরোশিয়া' নামেও অভিহিত করা হয়।

এ কথা আমাদের সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে যে, পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম বিদ্যমান বা প্রভাব বিস্তারকারী, তার সবগুলোর উৎপত্তি কিন্তু এশিয়াতে। সুতরাং এশিয়া হচ্ছে পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জরথুস্ত্র, ইসলামসহ সকল ধর্মের উৎপত্তিস্থল এশিয়াতে। সমগ্র ইউরোপে যে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থানও এশিয়াতে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অধিবাসীদের এশিয়ার প্রতি রয়েছে একটি ভিন্ন ধরনের আকর্ষণ। বিশেষ করে ইউরোপিয়ানদের সাথে এশিয়ানদের রয়েছে ঐতিহাসিক কাল থেকে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। ইউরোপকে মোটা দাগে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ বা Western Europe আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পূর্ব ইউরোপ বা Eastern Europe। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো হচ্ছে :

১. জার্মানি
২. ফ্রান্স
৩. যুক্তরাজ্য
৪. ইটালি
৫. স্পেন
৬. নেদারল্যান্ডস
৭. সুইডেন
৮. ডেনমার্ক
৯. সুইজারল্যান্ড
১০. পর্তুগাল
১১. নরওয়ে

www.waytojannah.com

উপর্যুক্ত দেশগুলো ব্যতিরেকে ইউরোপের অন্য দেশগুলোকে, যেমন—গ্রিস, রুমানিয়া, লাটভিয়া, জর্জিয়া, রাশিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ইত্যাদি দেশকে পূর্ব ইউরোপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পূর্ব এবং পশ্চিম অর্থাৎ পুরো ইউরোপ নিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পৃথিবীতে ইসলামের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীর ভূ-রাজনৈতিক কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। মহানবী (স.)-এর অনুসারীরা চীনের কাশগড় থেকে শুরু করে আটলান্টিকের তটরেখা পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে ইউরোপের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ঐতিহাসিকগণ এ মর্মে একমত যে, যদি ৭৩২ খ্রি. টুরসের যুদ্ধে (Baltle of Tours) আব্দুর রহমান আল-গাফেকী শার্লিমেনের কাছে পরাজিত না হতেন, তা হলে আজকের ইউরোপে গির্জার ঘণ্টা ধ্বনির পরিবর্তে আজানের সুর-লহরি ধ্বনিত হতো। যা হোক, টুরসের যুদ্ধের পরাজয় মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের দূরবর্তী সাম্রাজ্যসীমা নির্ধারণ করে দেয়। কেননা এর পরে মুসলমানরা পশ্চিম ইউরোপের দিকে আর সামরিক অভিযান প্রেরণ করেনি। এখানে আরেকটি তথ্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। আর তা হলো—উক্ত ঘটনার প্রায় ৬ শত বছর পরে তুর্কিদের উত্থানের পর তুর্কিরা যখন সমগ্র পূর্ব ইউরোপ দখল করে পশ্চিম ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, ঠিক সে সময় পারস্যের শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী সাফাভী বংশের শাহ আব্বাস প্রাচ্যে অর্থাৎ পূর্ব সীমান্তে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যার ফলে তুর্কিরা ইউরোপ অভিযান স্থগিত রেখে সাফাভীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদি সাফাভীরা নিশ্চুপ থাকত, তা হলে সমগ্র ইউরোপ তুর্কিদের পদানত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টিই হয়েছিল। কিন্তু শিয়া সাফাভীদের কারণে দ্বিতীয় সুযোগটিও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়।

ইউরোপে মুসলিম অভিঘাত : এশিয়া ও ইউরোপ পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশ হিসেবে দুই মহাদেশের মধ্যে স্মরণাতীতকাল থেকে যোগাযোগ ছিল। ইসলামের আবির্ভাব ও এর বিস্তৃতি ইউরোপের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তবে বিজয়ী রাজনৈতিক শক্তি অথবা প্রভাব বিস্তারকারী ধর্ম হিসেবে ইসলামের ইউরোপে অভিঘাতকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা—

প্রথম পর্যায় : খলিফা আল-ওয়ালিদের রাজত্বকালে ৭১১ খ্রি. তারিক-বিন-যিয়াদ ও মুসা-ইবনে-নুসায়ের কর্তৃক স্পেন বিজয়। এ বিজয়ের ফলে প্রথম ইউরোপে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় : প্রায় দুইশত বছর ধরে ক্রুসেডের মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ইউরোপীয়দের সরাসরি পরিচয় ঘটে। এ ক্রুসেড ১০৯৫ খ্রি. থেকে ১২৯১ খ্রি. পর্যন্ত থেমে থেমে চলছিল।

তৃতীয় পর্যায় : তুর্কি সালতানাতের উত্থানের পর তুর্কি সুলতান আর খানের শাসনামলে ১৩৫৩ খ্রি. পূর্ব ইউরোপের জিম্পি দখলের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপে অনুপ্রবেশ এবং ক্রমে সমগ্র পূর্ব ইউরোপ তুর্কি মুসলিমদের শাসনাধীনে আনয়ন।

www.waytojannah.com

চতুর্থ পর্যায় : আধুনিককালে ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাবিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে উন্নত জীবনযাপনের ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মুসলমানদের ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গমন ও অভিবাসন।

পর্যালোচনা : স্পেনকে বলা হয় Horn of Europe বা ইউরোপের শৃঙ্গ। মুসলিম বাহিনী উত্তর আফ্রিকা বিজয় করে খলিফা আল-ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে তারিক-বিন-যিয়াদের নেতৃত্বে জিব্রাল্টার প্রণালি পার হয়ে স্পেন অভিযান করে তৎকালীন স্পেনের শাসনকর্তা রডারিককে পরাজিত করে স্পেন দখল করেন। ৭১১ খ্রি. স্পেন বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানরা মুসলিম শাসনের যে ভিত রচনা করেছিলেন, প্রায় আটশত বছর ধরে ১৪৯২ খ্রি. পর্যন্ত রাজা ফর্দি ও রানী ইসাবেলার যৌথবাহিনী কর্তৃক মুসলিম নিধন ও বহিষ্কারের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তা টিকে ছিল। মুসলমানরা যে সময়ে স্পেন বিজয় করেন সে সময়ে স্পেনের তথা সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ আর ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা স্পেনের সাধারণ জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের নাগরিক সমাজ তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন—(ক) অভিজাত শ্রেণী, (খ) মধ্যবিত্ত ভূস্বামীবৃন্দ, (গ) ক্রীতদাস। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ছিল রাজন্যবর্গ, অমাত্যবর্গ, ধর্মযাজকগণ ও সামন্তরাজাগণ। মধ্যবিত্ত ভূস্বামীগণ ২৫ একর পরিমাণ জমির মালিক হতে পারতেন। ক্রীতদাসরা ছিল দু'রকমের। এক প্রকার হলো Serfs বা ভূমিদাস আর অন্য প্রকার ছিল Slave বা সাধারণ ক্রীতদাস। ভূমিদাসরা ভূমি রক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকত। সাধারণ দাসদেরকে কৃষক, মেষপালক, জেলে, কামার, গৃহস্থালির কাজ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হতো। একজন স্বাধীন নাগরিক ৪,০০০ থেকে ৮,০০০ পর্যন্ত ক্রীতদাস রাখতে পারত। ক্রীতদাসদের উপর এমন অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো যে তারা তাদের পেশা ছেড়ে দিয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যেত এবং জীবিকার তাড়নায় শেষ পর্যন্ত খুন-রাহাজানি এবং লুটতরাজে বাধ্য হতো। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'Serfs or slaves, for them there was no hope of freedom or gleam of sunshine on this side of the grave.' অর্থাৎ ভূমিদাস হোক আর সাধারণ ক্রীতদাস হোক, তাদের স্বাধীনতার আশা তো দূরের কথা কবরে যাওয়া পর্যন্ত একটু সূর্যরশ্মি লাভেরও তাদের নিশ্চয়তা ছিল না। সমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী আমোদ-প্রমোদ আর ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে লিপ্ত থাকত—আর তাদের ভোগবিলাসের সকল ব্যয়ের জোগান দিতে হতো নিম্ন শ্রেণীদেরকে।

তা ছাড়া গথগণ (goths) তিন শতাব্দী ধরে অর্থাৎ ৪০৯-৭১২ খ্রি. পর্যন্ত স্পেন শাসন করে আসছিল। তাদের শাসনামলে স্পেনে অরাজকতা অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ধর্মীয় বিভেদ চরম আকার ধারণ করে। নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে শাসকশ্রেণী ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিম্নস্তরে পতিত হয়। স্বয়ং রাজা রডারিকও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। তার হাতে সিউটার রাজকন্যা ফ্লোরিন্ডা লাঞ্ছিত হন। যার কারণে কাউন্ট জুলিয়ান অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক লুই বার্ট্রান্ড বলেন,

www.waytojannah.com

'Their reign was full of devastation, massacres, political assassinations, intestinal wars among the invading barbarians.' অর্থাৎ গথিকদের রাজত্বকাল ছিল গণহত্যা, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা এবং গথিক বর্বর উপদলগুলোর মধ্যে নিরন্তর সংঘাত ও অরাজকতা পরিপূর্ণ। তাই তারিক-মুসার অভিযানকারী দল যখন স্পেনে অবতরণ করে তখন স্পেনবাসী মুসলিম বাহিনীকে স্বাগত জানায়। রডারিকের পরাজয়ের পর স্পেনের নগর পিতারা একে একে মুসলিম বাহিনীর জন্য শহরের ফটক উন্মুক্ত করে দেয়। তাই Dozy বলেন, 'God granted the the Spaniards Clear sky, sea-girt coast, fine land-scape and beautiful damsels but did not grant them good ruler.' অর্থাৎ বিধাতা স্পেনবাসীদেরকে পরিচ্ছন্ন আকাশ, খাড়া সমুদ্র উপকূল, মনোহর নৈসর্গিক ভূমি এবং সুন্দরী ললনা দান করেছেন কিন্তু কোনো ভালো শাসক তাদের জন্য মঞ্জুর করেননি।

স্পেন বিজয়ের পর মুসলমানরা সেখানে উন্নত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের শাসনামলে স্পেন শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি, রাস্তা-ঘাট-সেতু, বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়, সুশোভিত রাজধানী কর্ডোভাকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করে। তখন স্পেনকে 'Light house of Europe' বা ইউরোপের বাতিঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। মুসলমানদের উন্নত সভ্যতা, জীবনযাপন, উন্নত সংস্কৃতি স্পেনবাসীদেরকে এত প্রলুব্ধ করেছিল যে, সেখানকার একশ্রেণীর খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ না করেও মুসলিম বেশভূষা ও মুসলিম সংস্কৃতি অনুকরণ করত। এদেরকে 'মোজারব' বলা হতো। তাই স্পেন বিজয়ের ফলে ইউরোপবাসী মুসলিম সভ্যতার সাথে পরিচিত হতে শুরু করে এবং ইউরোপে ইসলামের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রুসেডের মাধ্যমেও ইউরোপে ইসলামের বিস্তার ঘটে। কথাটি আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও ইতিহাসের সাক্ষ্য তাই প্রমাণ করে। যেহেতু ১০৯৫ খ্রি. থেকে ১২৯১ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর ধরে ইউরোপের খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে থেমে থেমে এ যুদ্ধ চলছিল এবং মোটা দাগে আটটি ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল এবং ক্রুসেড উপলক্ষে খ্রিস্টান ও মুসলিম শক্তির মধ্যে শৌর্য-বীর্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। মুসলিম সেনাবাহিনীর মানবিকতাবোধ এবং উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং ইউরোপবাসী ইসলামি সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে খ্রিস্টান পোপ এবং পাদ্রিরা খ্রিস্টান যুবকদেরকে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা তথ্য, মিথ্যা আশ্বাস, মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধ করতে এসে তারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে যে, পোপ ও পাদ্রিদের এসব বক্তৃতা এবং সম্ভাষণ ছিল মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তারা মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি এবং মুসলমানদের মানবিকতাপূর্ণ আচরণ দেখে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম দেশে থেকে যায় আবার অনেকে স্বদেশে ফেরত চলে যায়। এভাবে 'ক্রুসেড' বা ধর্মীয় যুদ্ধ তথা ক্রুসেডারদের ভাষায় পবিত্র যুদ্ধ (Sacred war)

www.waytojannah.com

ইউরোপবাসীর সামনে ইসলামি সভ্যতার বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত করে দেয় এবং ইউরোপবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

ক্রুসেডের ফলে খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে বেশি বেশি মেলামেশা শুরু হয়। ক্রুসেডাররা তাদের প্রতিপক্ষের গুণাবলি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান হারে উপলব্ধি মুসলমানদের গুণাবলির স্বীকৃতি দিতে শুরু করে এবং অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রথম ক্রুসেডের সময় Rainaud নামক জনৈক নাইটের (বীরযোদ্ধা—ইউরোপীয় পদবি) অধীনস্থ একদল জার্মান ও লোম্বার্ডের সৈন্য মূল বাহিনী থেকে নিজেদের পৃথক করে ফেলে এবং সেলজুক সুলতান আরসালান কর্তৃক একটি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়। অবরোধকারীদেরকে আক্রমণ করার ভান করে Rainaud এবং তার ব্যক্তিগত অনুসারীরা নিজস্ব সৈন্যদল ত্যাগ করে তুর্কিদের পক্ষে যোগ দেয় এবং সেখানে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

অশুভ দ্বিতীয় ক্রুসেডের যুদ্ধে ও একই ধরনের ঘটনার অবতারণা দেখা যায়। সেন্ট ডেনিসের ওডো অবওডিয়ুল নামক জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক বর্ণিত কাহিনীটি এখানে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে সপ্তম লুইয়ের ব্যক্তিগত যাজক হিসেবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এর যে বাস্তব বিবরণ দিয়েছেন তা এরূপ—স্থলপথে এশিয়া মাইনর হয়ে জেরুজালেম যাওয়ার প্রাক্কালে ক্রুসেডাররা phrysia গিরিপথের নিকট তুর্কিদের কাছে মারাত্মকভাবে পরাজিত হয় ১১৪৮ খ্রি. এবং অতিকষ্টে আস্ত্রাসিয়া সমুদ্রবন্দরে পৌঁছয়। এখানে গ্রিক ব্যবসায়ীদের অত্যধিক দাবি পূরণের সামর্থ্য যাদের ছিল তারা এন্টিওকের জাহাজে চড়ে বসে। আর রুগ্‌ণ, আহত ও বিপুলসংখ্যক তীর্থযাত্রীকে তাদের বিশ্বাসঘাতক মিত্র গ্রিসদের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। তারা এই শর্তে লুইয়ের নিকট হতে পাঁচশত মার্ক গ্রহণ করে যে, তারা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে প্রহরী দেবে এবং রুগ্‌ণদের যত্ন নেবে যে পর্যন্ত না তারা সেরে ওঠে এবং অন্যত্র প্রেরণ করার মতো সবল হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেনাবাহিনী চলে যেতে না যেতেই গ্রিকরা তুর্কিদের নিকট তীর্থযাত্রীদের অসহায় অবস্থার সংবাদ প্রেরণ করে এবং যখন দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধি এবং শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এ ভাগ্যহীনদের শিবিরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসসাধন করে তখন তারা তা নীরবে দেখতে থাকে। মরিয়া হয়ে তিন থেকে চার হাজারের একটি দল পালাতে চেষ্টা করে। তাদেরকে তুর্কিরা চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে এবং কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এরপর বিজয় নিশ্চিত করার জন্য তুর্কিরা খ্রিস্টান শিবিরের দিকে অগ্রসর হয়ে চাপ সৃষ্টি করে। বেঁচে যাওয়া লোকদের অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক হতো যদি না খ্রিস্টানদের করুণ অবস্থা দেখে মুসলিম সৈনিকদের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক না হতো। মুসলমানরা আহত খ্রিস্টান রুগ্‌ণদের চিকিৎসা করে। দরিদ্রদের মুক্তি দেয় এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি মুক্তহস্তে উদারতা দেখায়। তাদের কেউ কেউ ফরাসি মুদ্রা কিনে নেয়। অথচ তাদের স্বধর্মী গ্রিকরা তাদের নিকট থেকে বলপূর্বক এই মুদ্রা হাতিয়ে নিয়েছিল।

পক্ষান্তরে মুসলমানরা অভাবী খ্রিস্টানদের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বিতরণ করে। তীর্থযাত্রীরা মুসলমানদের নিকট থেকে সদয় ব্যবহার পায়। অথচ তাদের একই ধর্মের

www.waytojannah.com

অনুসারী গ্রিকরা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করেছিল এবং তাদের উপর জবরদস্তিমূলক শ্রম চাপিয়ে দিয়েছিল, তাদেরকে প্রহার করেছিল এবং তাদের নিকট যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাও কেড়ে নিয়েছিল। উভয়ের ব্যবহারে এই যে বিরাট পার্থক্য তা দেখে তীর্থযাত্রীদের অনেকে স্বেচ্ছায় তাদের মুক্তিদাতাদের অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করে। আমরা শুনতে পেয়েছি যে, তিন হাজারেরও বেশি লোক গ্রিকদের চাকরি ছেড়ে তুর্কিদের পক্ষে যোগ দেয়। তবে তুর্কিরা তাদের একজনকেও ধর্ম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করেনি। খ্রিস্টানরা মুসলমান হয়েছিল স্বেচ্ছায়।[১]

ঘন ঘন যুদ্ধবিরতির সময়ে কখনো কখনো ক্রুসেডার এবং মুসলমানরা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনায় বসত, তখন ধর্মীয় প্রশ্নটি তাদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে চলে আসত এবং এটাই স্বাভাবিক। তারা কীভাবে অস্বীকার করতে পারে যে, ধর্মই তাদেরকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে অব্যাহতভাবে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত করে ফেলেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা ব্যক্তিগত মেলামেশা থেকেও মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কে আরো সঠিক জ্ঞান লাভ করত এবং প্রাপ্ত তথ্যের মূল্যায়ন না করে পারত না। এভাবে নতুন চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনায় অস্থিরতা দেখা দেয়। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নতুন মতবাদ। এটা আশ্চর্যজনক কিছু নয় যে—এ অবস্থাটা অনেকেই ইসলামের গণ্ডির মধ্যে নিয়ে এসেছিল।

ক্রুসেড পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্যতম এবং উন্মাদনাময় এক বিরল ঘটনা, যার ক্ষত সারা বিশ্ব এখনো বয়ে চলেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক একে 'One of the maddest episodes in history' অর্থাৎ ইতিহাসের সবচেয়ে উন্মাদনাময় আখ্যানের একটি ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর ফলাফল ও বিভীষিকাময় ঘটনাবলি নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেহেতু ক্রুসেডের ফলে ইউরোপে ইসলামের কী প্রভাব পড়েছিল এবং ইসলামের প্রসারে এর ভূমিকা কী—তাই নিয়ে বক্ষ্যমাণ আলোচনা, তাই এখানে তৃতীয় ক্রুসেডসহ অন্যান্য ক্রুসেডের প্রভাব সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

গাজী সালাহউদ্দীনের জেরুজালেমের পুনরুদ্ধারের সফলতায় সমগ্র ইউরোপ ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। ইউরোপের এই মহাদুর্দিনে তিনজন সম্রাট জার্মানির ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টা তৃতীয় ক্রুসেডের (১১৮৯–১১৯১ খ্রি.) আয়োজন করে। এর প্রধান ঘটনা হচ্ছে আক্রা অবরোধ। সেখানে রাজা রিচার্ড ২৭০০ মুসলিম যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করে ভয়াবহ নৃশংসতার পরিচয় দেয়। কিন্তু ইতোমধ্যে খ্রিস্টান শিবিরে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেখা দেয়। তখন অনেকে শিবির ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং অনেকে ক্ষুধার তাড়নায় মুসলিম শিবিরে গিয়ে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। এদের অনেকে আবার ক্রুসেডার বাহিনীতে ফিরে আসে, অনেকে মুসলমানদের মানবিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের সাথে থেকে যায়। স্বয়ং রাজা রিচার্ডও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। গাজী সালাহউদ্দীন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক পাঠিয়ে তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করেন এবং অনেক ফলমূল উপহার দেন। শেষে রিচার্ড সালাহউদ্দীনের সাথে সন্ধি করে স্বদেশে চলে যান।

www.waytojannah.com

১১৯৩–১২৯১ খ্রিস্টাব্দকে ক্রুসেডের তৃতীয় যুগ হিসেবে ধরা হয়। এ সময়ে মোট পাঁচটি ক্রুসেড সংঘটিত হয়। পোপ তৃতীয় সেলেস্টাইন চতুর্থ ক্রুসেড (১১৯৫–৯৮ খ্রি.) ঘোষণা করেন। গাজী সালাহউদ্দীনের পুত্র আদিলের হাতে ক্রুসেডারগণ পরাজিত হয়ে ১১৯৮ খ্রি. সন্ধি স্বাক্ষর করে ফিরে যায়।

১২০০ খ্রি. পোপ তৃতীয় ইনেনোসেন্ট পঞ্চম ক্রুসেড ঘোষণা করেন। ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ব্যতীত অন্যান্য রাজন্যবর্গ এতে যোগ দেন। কিন্তু ক্রুসেডারগণ সিরিয়ার পরিবর্তে কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করে অনেক গ্রিক নর–নারীকে হত্যা করে স্বদেশে ফেরত যায়। মনে করা হয় যে, গ্রিকদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ক্রুসেডারগণ স্ব–জাতির উপর এভাবে চড়াও হয়।

১২১৬–১৭ খ্রি. পোপ তৃতীয় ইনেনোসেন্ট ষষ্ঠ ক্রুসেড ঘোষণা করেন। ক্রুসেডারগণ মিশর ও ডামিয়েটা আক্রমণ করে সত্তর হাজার অধিবাসীকে হত্যা করে কায়রো আক্রমণ করলে মুসলমানরা তা প্রতিহত করে। ১২২১ খ্রি. ক্রুসেডারগণ আবার সন্ধি করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

পোপ নবম গ্রেগরি ১৩৩৮ খ্রি. সপ্তম ক্রুসেডের এবং ১২৪৪ খ্রি. ফ্রান্সের নবম লুই অষ্টম ক্রুসেডের আয়োজন করেন। কিন্তু আইয়ুবের পুত্র তুরান শাহ কর্তৃক ক্রুসেডারগণ পরাজিত হয় এবং নবম লুই বন্দি হন। পরিশেষে নবম লুই সন্ধির মাধ্যমে মুক্তিলাভ করে স্বদেশে ফেরত যান। অতঃপর মুসলমানগণ কৃতিত্বের সাথে অভিযান চালিয়ে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খ্রিস্টানগণ কর্তৃক অধিকৃত সকল স্থান পুনরুদ্ধার করে। এভাবে খ্রিস্টানদের মাধ্যমে শুরু হওয়া ইতিহাসের এক জঘন্যতম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ক্রুসেডের সময় থেকে যারা পবিত্র ভূমি (জেরুজালেম) এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করেছেন তাদের লেখায় ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে ঘন ঘন উল্লেখ পাওয়া যায়। সেন্ট লুইকে (অষ্টম ক্রুসেডে) মুসলমানরা বন্দি করে এবং তার উপর ধার্যকৃত মুক্তিপণ প্রদানের জন্য তাকে শপথ করার প্রস্তাব দেয়া হয়। উক্ত শর্তসমূহ নির্ধারণের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন কিছুসংখ্যক হুইলন পাদ্রি এবং তারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে অসংখ্য বিবরণী পাওয়া যায় যাতে দেখা যায় যে, ক্রুসেডের কারণে অনেক ইউরোপবাসী মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে শেষ পর্যন্ত পবিত্র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইউরোপে ইসলামের বিস্তার ঘটে।

ইউরোপে মুসলিম অভিঘাতের তৃতীয় পর্যায় : তুর্কি সালতানাতের উত্থানের পর সুলতান অর খানের শাসনামলে ১৩৫৩ খ্রি. জিম্পি অধিকারের মাধ্যমে ইউরোপে মুসলমানদের তৃতীয় অভিঘাত শুরু হয়। এ অভিঘাতের ফলে প্রায় সমগ্র পূর্ব ইউরোপ মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে আসে। তুর্কি সুলতান বায়েজিদের সময়ে (১৩৮৯–১৪০২ খ্রি.) চালকিইক এবং কন্সটান্টিনোপলের ঠিক চতুষ্পার্শ্বের জেলা ব্যতীত এজিয়ান থেকে দানিউব পর্যন্ত সকল রাজ্য যথা বুলগেরিয়া, ম্যাসিডোনিয়া এবং থ্রেস তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক John J. saunders বলেন, 'Constantinaple was about to fall, the Balkan peninsula has being over-run,

www.waytojannah.com

and the Christian powers were fighting desperrately to hold the line of the Danube.'

দ্বিতীয় মুরাদ (১৪২১–১৪৫১ খ্রি.) চালকিইক অধিকার করে আদ্রিয়াটিক পর্যন্ত তার বিজয় সম্প্রসারিত করেন। দ্বিতীয় মোহাম্মদ যিনি মুহাম্মদ আল–ফাতাহ্ নামেও পরিচিত তিনি কন্সটান্টিনোপল, আলবেনিয়া, বসনিয়া এবং সার্বিয়া দখল করে ভেনিস এবং মন্টিনিগ্রোর অধীনে উপকূলীয় অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণ–পূর্ব উপদ্বীপের একমাত্র অধিপতি হয়ে যান। দ্বিতীয় সুলাইমান হাঙ্গেরি অধিকার করে এজিয়ান সাগরকে ওসমানী সাম্রাজ্যের অধীন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি বিজয় সম্পন্ন হয় এবং পোল্যান্ড মুসলমানদের নিকট পডোলিয়া হস্তান্তর করে। এভাবে দেখা যায় যে, প্রায় সমগ্র পূর্ব ইউরোপ মুসলমানদের পদানত হয়ে পড়ে।

তুর্কিদের হাতে পূর্ব ইউরোপের পতনের পর সেখানে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। ইউরোপের খ্রিস্টান পাদ্রি এবং তথাকার ভূ–স্বামী ও শাসকদের অত্যাচার ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে জনসাধারণ অসহায় অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল এবং তারা তুর্কি শাসকদের স্বাগত জানিয়েছিল। আর্চবিশপসহ অনেক পাদ্রি তাদের পদবি ও সুযোগ–সুবিধা রক্ষার জন্য তুর্কিদেরকে সহায়তা দিয়েছিল। কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের পর প্রথম নির্বাচিত আর্চবিশপ গেন্নাদি ও স্বয়ং সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের হাত থেকে বিশপের জন্য প্রতীকী দণ্ড গ্রহণ করেন এবং চার্চের প্রধান হিসেবে জমকালো এক শকটে আরোহণ করে সদলবলে নগরী প্রদক্ষিণ করেন। উচ্চস্তরের পাদ্রিরা সাধারণ পাদ্রি হিসেবে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি তৎপরতা দেখাতেন এবং তারা জনগণকে সর্বদা বুঝাতেন যে, অর্থডক্সে চার্চের সংরক্ষক হিসেবে সুলতানের দৈব অনুমোদন রয়েছে।

বস্তুত তুর্কিদের শাসনামলে গির্জার অধিকার যেমন অক্ষুণ্ন রাখা হয় তেমনি জনসাধারণের সুযোগ–সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তুর্কি সুলতান সুলায়মানকে তার উন্নত শাসনের জন্য ইউরোপীয়গণ The Magnificant বা মহামতি উপাধি দিয়েছিলেন আর মুসলিমরা তাকে সুলায়মান কানুনী বা Law-giver (আইনদাতা) হিসেবে অভিহিত করত। ঐতিহাসিক Lord Creasy তার 'History of the Ottoman Empire' গ্রন্থে বলেন, 'Sulaiman deserves a degree of admiration which we can accord to none of his crowned contemporaries in that age of melancholy injustice and persecution between the Roman Catholics and protestants throughout the christian world.'

ইসলামে নবদীক্ষিত কোনো লোককে অভিনন্দন জানিয়ে সাধারণ মানুষ যে আনন্দ প্রকাশ করত, তা এটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, মানবাত্মার জন্য ঐকান্তিক ভালবাসাই এ লোকদেরকে উৎসাহী ধর্মান্তকারীতে পরিণত করেছিল। নবদীক্ষিত মুসলমানকে একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে নগরীর সড়কসমূহ দিয়ে বিজয় মিছিল করা হতো। যদি জানা যেত যে, তিনি প্রকৃতই সততার সঙ্গে তার ধর্ম পরিবর্তন করেছেন এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দাখিল হয়েছেন অথবা যদি তিনি কোনো উঁচু মর্যাদার লোক হতেন তাহলে তাকে অত্যন্ত সম্মানের

www.waytojannah.com

সাথে গ্রহণ করা হতো এবং তার জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হতো। তুর্কিরা ধর্মান্তরিত সন্ন্যাসী ও পাদ্রিদের জন্য ভিন্নতর বরাদ্দের ব্যবস্থা করত, যেন তাদের অনুসরণ করে অন্যরাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। যখন আদ্রিয়ানোপল তুরস্কের রাজধানী ছিল (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) তখনো খ্রিস্টধর্ম ত্যাগীদের দ্বারাই রাজদরবার ছিল পূর্ণ এবং তারাই ছিল সেখানকার প্রভাবশালীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ইতিহাসের গতিধারার বিভিন্ন পর্যায়ে ইউরোপের জনজীবনে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইউরোপীয়দের মন–মানসে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

চতুর্থ পর্যায় : আধুনিক ইউরোপে উন্নত জীবনযাপন ও সুযোগ–সুবিধা লাভের আশায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপে মুসলমানদের গমনাগমন ও অভিবাসনকে ইউরোপে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের চতুর্থ পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মুসলমানরা পৃথিবীর যেখানেই গমন করে সেখানে তারা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে সাথে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুসলমানরা যেখানেই অভিবাসিত হয়েছে সেখানে তারা ইবাদত করার নিমিত্তে একটি মসজিদ তৈরি করেছে। আর মসজিদের নির্মাণ ও স্থাপত্য কৌশল ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবগাথা ভিন্ন সংস্কৃতির জনগণের সামনে সগৌরবে উপস্থাপন করেছে। ঐতিহাসিক J. J. Saunders বলেন, 'The Muslims, proud of their rich and ancient culture did not doubot their superiority in every field over their Chiristian foes.' সুতরাং যে জনপদে তাদের আগমন ঘটবে, সেখানে মুসলিম সভ্যতার বিকাশের একটি ফল্গুধারা বহমান থাকবেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের আবির্ভাব থেকে ১৫৫০ খ্রি. পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের যে বিজয় ডঙ্কা দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা–বাণিজ্যের পথগুলো তাদের করায়ত্ত থাকার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর তাদের একক আধিপত্য বজায় ছিল, যার মাধ্যমে তারা বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তির নিয়ামকে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক J. J. Saunders বলেন, 'Nearly all the great high ways of international trade were in Muslim hands and the wealth of the Muslim kingdoms was drawn largely from the profits of commerce.' কিন্তু ১৫৫০ খ্রি. থেকে হঠাৎ করেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। J. J. Saunders বলেন, 'By 1550 (A. D.) the situation had been almost magically transformed.' পর্তুগিজদের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার পথ আবিষ্কারের ফলে ভারত মহাসাগরের উপর আরব আধিপত্য খর্ব করে দেয়। তা ছাড়া পর্তুগিজরা মিশর–তুর্কি আধিপত্য খর্ব করে সাগর–মহাসাগর বক্ষে তাদের বাণিজ্যিক তৎপরতা অব্যাহত রেখে মুসলিম বাণিজ্যিক আধিপত্যকে কোণঠাসা করে ফেলে। এজন্য তুর্কিরা আক্ষেপ করে বলত 'God has given the land to us but the sea to the Chiristians.' বাণিজ্যিক অগ্রগতির সাথে সাথে ইউরোপে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং রেনেসাঁর উদ্যম ও তাদেরকে প্রণোদনা জোগায়। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব ইউরোপে অগ্রগতির পথ নির্দেশক ভূমিকা পালন করে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁ, ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডসহ সমগ্র ইউরোপকে অগ্রগতির

www.waytojannah.com

দিকে পরিচালিত করে। অপরদিকে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি বিশেষভাবে তুর্কিরা এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা না রাখতে পারার কারণে পিছিয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ইউরোপ যে অগ্রগতির ধারা সূচনা করেছিল আজো তা অব্যাহত আছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমেরিকাও এদের কাতারে শামিল হয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পিছিয়ে পড়া মুসলিম শক্তির প্রভাব বিশ্বরাজনীতি ও কর্তৃত্ব থেকে ক্রমান্বয়ে ক্ষয় হতে হতে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। বিশ্বের বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব ইউরোপীয়দের হাতে চলে যাওয়ার পর মুসলিম সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। ইউরোপের অভাবনীয় উন্নতি মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাতে শুরু করে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। এভাবে অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আজকের ইউরোপে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে।

ইউরোপে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা : এ কথা অনস্বীকার্য যে, অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়ায় সমগ্র ইউরোপ ধীরলয়ে হলেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। তবে এ কথা ভাববার মুক্ত অবকাশ নেই যে, তারা সেখানে খুব ভালোভাবে আছে। Racism এবং Aparthied বা বর্ণবাদ বাহ্যিকভাবে ইউরোপ থেকে বিদায় নিলেও তাদের মানসিক স্তরে তা ক্রিয়াশীল আছে। মুক্তচিন্তা ও সেক্যুলারিজমের কথা বলা হলেও মুসলমানগণ সেখানে বিভিন্নভাবে প্রায়শ বিপাকে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ এখানে সুইজারল্যান্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্পস পর্বতমালার কোলে অবস্থিত সুইজারল্যান্ড একটি ছবির মতো দেশ। এ দেশটি অর্থনৈতিক সক্ষমতা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতার জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন একটি দেশের জনসংখ্যার একটি অংশ Islam ophobia বা ইসলাম ভীতিতে আক্রান্ত এবং মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। দেশটির মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৩% মুসলিম। অবশ্য এ সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে সুইজারল্যান্ডে একটি মসজিদের মিনার নির্মাণ করতে গেলে মুসলিমগণ সেখানে খ্রিস্টানদের বাধার মুখে পড়েন। Swiss People's party সংক্ষেপে (SVP) সরকারকে এ ব্যাপারে Referendum-এর ব্যবস্থা করার আহ্বান জানায়। SVP মিনার বন্ধ করার পক্ষে মত দেয়ার জন্য আহ্বান জানায়। সেখানকার জনগণ মিনার নির্মাণের বিপক্ষে মত দেয়। যার ফলে উক্ত মসজিদের মিনার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। SVP-র বক্তব্য হলো এভাবে মিনার নির্মিত হলে 'it could inflame extremism and lead to a rampant Islamisation of the country.' অর্থাৎ এভাবে প্রতিটি মসজিদে মিনার নির্মিত হলে গোঁড়ামি উজ্জীবিত হবে এবং দেশটি ইসলামিকরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে। তাই গণভোটের মাধ্যমে মসজিদটিতে মিনার সংযুক্তকরণ নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য সুইস বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী Eveline Widmer-Schlumpf বলেন যে, 'Marginalisation and exculsion on basic of religious and cultural differences would be devastating for an open country such as Switzerland.' মিনার তৈরি নিষিদ্ধকরণ বিষয়টি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য

www.waytojannah.com

করেন যে, 'It is an expression of intolerence.' তা ছাড়া মুসলিম মহিলাদের ইসলামিক হিজাব 'বোরকা' পরাও ইটালি ও ফ্রান্সের মতো দেশে নিষিদ্ধ করার পায়তারা চলছে এবং এসব ব্যবস্থা তারা নিতে যাচ্ছে anti-Muslims xenophobia বা মুসলিমবিরোধী ভীতি বা অভিবাসী ভীতি থেকে। তবে এতসব নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও মানুষদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখা যাচ্ছে না।

সাধারণভাবে সমগ্র ইউরোপে একমাত্র ইংল্যান্ড ব্যতীত মুসলমানদের অবস্থা খুব সুখকর নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের হার ১ থেকে ১৩ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউরোপের উন্নত দেশসমূহে যদিও মুসলমানরা তাদের নিজ দেশের তুলনায় অধিক উপার্জন করে কিন্তু স্থানীয় জনগণের তুলনায় তাদের আয় অনেক নিম্ন পর্যায়ের।

যে হারে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে সে তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেক কম। অনেক অভিবাসী যারা বহুপূর্বে ইউরোপে গমন করেছিল এবং বর্তমানে তাদের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রজন্ম ইউরোপের নাগরিক কিন্তু এদেরঅনেকে ghettose/ঘেটো বা বস্তিসমতুল্য গৃহে বসবাস করে। খুব কম সংখ্যক মুসলিম অভিবাসী উচ্চতর বেতন অথবা আয়ের মাধ্যমে সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করে থাকে। পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে ৬.৪ মিলিয়ন বা জনসংখ্যার দশ ভাগ, জার্মানিতে ৩.২ মিলিয়ন বা ৩.৯% এবং ব্রিটেনে ৩.৩%।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। বিশ্ব মানচিত্রে ইউরোপের অবস্থান দেখাও।
২। পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের নাম লিখ।
৩। পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের নাম লিখ।
৪। 'Battle of Tours'-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫। তুর্কিদের ইউরোপ অভিযানের প্রাক্কালে শিয়া সাফাউ বংশের শাহ আব্বাসের ভূমিকা কী ছিল?

রচনামূলক

১। '১০৯৫ খ্রি. থেকে ১২৯১ খ্রি. পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত ক্রুসেড ইউরোপে ইসলামের বিস্তৃতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল'—ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।
২। ইউরোপে মুসলমানদের গমনাগমনের চতুর্থ পর্যায়ের উল্লেখপূর্বক বর্তমান সময়ে ইউরোপে বসবাসরত মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর।

---

১. The preaching of Islam. অনু. মো. সিরাজ মান্নান ও ইব্রাহীম ভূঁইয়া

www.waytojannah.com

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তর আমেরিকায় মুসলমান

উত্তর আমেরিকায় ইসলামের বিস্তার : আমেরিকার মুসলিম অভিবাসী—আমেরিকার মুসলিম সম্প্রদায়ের বিবর্তন—আমেরিকাতে মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংগঠন এবং তাদের আন্দোলন—অর্থনৈতিক জীবনধারা।

আমেরিকার ভৌগোলিক পরিচিতি : পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের মধ্যে আমেরিকা অন্যতম একটি মহাদেশ, যাকে আমরা সাধারণত USA বা ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা হিসেবে চিনি। এটি মূলত উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত। ভূ–আয়তনের দিক থেকে এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। আমেরিকার ৫০টি স্টেটের মধ্যে ৪৮টি পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। বাকি দুটি স্টেটের মধ্যে হাওয়াই দ্বীপ স্টেট প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এবং আলাস্কা স্টেট কানাডার উত্তর–পশ্চিমে অবস্থিত। এটি পূর্ব উপকূল হতে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত ৩,০০০ মাইল বা ৪,৮০০ কিলোমিটার এবং উত্তরে কানাডার সীমান্ত হতে দক্ষিণে মেক্সিকো সীমান্ত পর্যন্ত ১৫০০ মাইল বা ২,৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। মিসিসিপি, মিসৌরি এবং ওহিও আমেরিকার বিখ্যাত নদী। এদের সঞ্জীবনী ধারা আমেরিকাকে করেছে শ্যামলময়।

আমেরিকাতে রয়েছে অনেক পর্বত ও পর্বতশ্রেণী। তন্মধ্যে The Appalacian Mountain range আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে এবং পশ্চিমাঞ্চলে The Rocky Mountains অবস্থিত। এখানে রয়েছে অনেকগুলো হ্রদ এবং মরুভূমি। হ্রদগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie এবং Lake Ontario. The Great Salt Lakeটি পশ্চিমাঞ্চলের মরুভূমি এলাকায় অবস্থিত। এখানকার মরুভূমিগুলোর মধ্যে The Majave, The Gila এবং The Painted Desert প্রসিদ্ধ। এগুলো দেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।

১৪৯২ খ্রি. কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পর ইউরোপীয়রা আমেরিকাতে কলোনি স্থাপন করা শুরু করে। স্পেনীয়রা ফ্লোরিডার সেন্ট অগাস্টিনে প্রথম কলোনি স্থাপন

www.waytojannah.com

করে। এরপর ১৬০৭ খ্রি. ব্রিটিশগণ ভার্জিনিয়ার জেমসটাউনে তাদের কলোনি স্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশগণ ভার্জিনিয়াসহ আরো তেরটি রাজ্যে তাদের কলোনি স্থাপন করে। এগুলো হচ্ছে—(১) ভার্জিনিয়া, (২) ম্যাসাচুয়েটস, (৩) মেরিল্যান্ড, (৪) রোড আইল্যান্ড, (৫) কানেকটিকাট, (৬) নিউ হ্যামসপায়ার, (৭) নর্থ ক্যারোলিনা, (৮) সাউথ ক্যারোলিনা, (৯) নিউইয়র্ক, (১০) নিউজার্সি, (১১) পেনসিলভানিয়া, (১২) ডিলাওয়ার এবং (১৩) জর্জিয়া। পরবর্তী পর্যায়ে আরো ৩৭টি স্টেট আমেরিকার ইউনিয়নে যোগদান করে। যার কারণে বর্তমানে আমেরিকার মোট স্টেটের সংখ্যা ৫০টি। আমেরিকার জাতীয় পতাকাতে যে তেরটি গোলাপি ও সাদা রঙের স্ট্রাইপ এবং পতাকার কোণে যে ৫০টি তারকা তা আমেরিকার মূল তেরটি স্টেট এবং পরবর্তীতে যোগদানকারী স্টেটসহ মোট ৫০টি স্টেটের ইঙ্গিতবহ।

আমেরিকার নেটিভ বা আদিবাসীদের 'রেড ইন্ডিয়ান' বলা হয়। কোনো কোনো স্টেটে এরা ছিল অভিবাসীদের প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্ন আবার কোনো প্রদেশে এরা ছিল অভিবাসীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। যার ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘাত বাধে এবং অভিবাসীরা উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে পরাজিত করে তাদের জমিজমা দখল করে নেয় এবং তাদেরকে পশ্চিমাঞ্চলের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। এভাবে আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায়।

আমেরিকায় মুসলিমদের আগমনের ইতিহাস : আমেরিকার প্রখ্যাত লেখক Eline Kirn (ইলাইন কার্ন) About the USA গ্রন্থে বলেন, 'The history of the United States is the history of immigration.' অর্থাৎ আমেরিকার ইতিহাস হচ্ছে মূলত অভিবাসনের ইতিহাস, মানে আজকের যে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী আমেরিকা আমরা দেখতে পাই তা প্রধানত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লাখো অভিবাসীদের শ্রম এবং ভালবাসার উৎসর্গে তৈরি। বর্তমানে আমেরিকায় যে মুসলমানগণ বসবাস করছেন তারাও এখানে অভিবাসী। অন্যান্য জাতির মতো তাদের পূর্বপুরুষরা এখানে আগমন করেন এবং একটি সমৃদ্ধিশালী আমেরিকা গঠনে তাদের শ্রম, মেধা ও মনন উৎসর্গ করেন। তাই বর্তমানে আমেরিকার সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের অবদান কোনো অংশে কম নয়।

কোন মুসলিম সর্বপ্রথম নব আবিষ্কৃত আমেরিকার ভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন তা আজো অজানা। তবে একটি জনপ্রিয় জনশ্রুতি আছে যে, কলম্বাসের আবিষ্কারের পূর্বে এই মহাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ আল-শরীফ আল-ইদ্রিসীর মতে কলম্বাসের আমেরিকায় আগমনের পূর্বে এখানে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। মুসলমানদের আগমন যে কোনো দেশে এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা যেখানে গিয়েছে সেখানেই তাদের ধর্মবিশ্বাসকেও সাথে করে নিয়ে গিয়েছে (They brought their faith with them wherever they went.)। তাই আমেরিকাতে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে সেখানে ইসলামেরও আগমন ঘটে। অনেকে মনে করেন যে, পর্তুগিজ এবং স্পেনীয় ভৌগোলিক আবিষ্কারকগণ মুসলিম নাবিকদের সহায়তায়

www.waytojannah.com

আমেরিকা পৌঁছেছিলেন। এসব মুসলিমদেরকে ‘মরিস্ক’ বলা হতো। এরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টান হওয়ার ভান করত এবং এরা নৌবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের আগমনকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়, আর দ্বিতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়। ১৮৮০ সালের পূর্ববর্তী সময়ে আমেরিকানগণ সমগ্র বিশ্ব থেকে আমেরিকায় অভিবাসিত হওয়ার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কারণ আমেরিকা তখন পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং এসব অঞ্চলে শিল্প–কারখানা তৈরি ও পরিচালনার জন্য প্রচুর জনবলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আমেরিকায় অভিবাসী হওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করা হয়। নিচে কয়েকটি অভিবাসী আইনের উল্লেখ করা হলো :

বছর	আইন বা অধ্যাদেশ	বিষয়বস্তু
১৮৮২	The Chinese exclusion act	এই অধ্যাদেশ চীনাদেরকে আমেরিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।
১৯০৭	Roosevelts gentlemen's agreement	এই আইনে জাপানি শ্রমিকদের নিষিদ্ধ করা হয়।
১৯১৭	The Literacy Test Act	এই আইনে অশিক্ষিতদেরকে আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।
১৯২৪	An immigration act The National origins act	এই আইনে কোটা পদ্ধতি চালু করা হয়। এই আইনে জাপানিজ, চাইনিজ এবং এশিয়ানদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়।
১৯৪৮	The Displaced persons act The Fulbright act	এই আইনে ৫০০০০০ যুদ্ধের শিকার ছিন্নমূল মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপনের সুযোগ দেয়া হয়। এই আইনে সমগ্র পৃথিবী থেকে স্কলারদেরকে আমেরিকা অভিবাসনের সুযোগ দেয়া হয়।

এ ছাড়াও ১৯৫২ সনে ম্যাককারান ওয়ান্টার অ্যাক্ট, ১৯৫৩ সনে রিফিউজি রিলিফ অ্যাক্ট, ১৯৬৫ সনে অ্যান ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট এবং ১৯৮৬ সালে দি ইমিগ্রেশন রিফর্ম কন্ট্রোল অ্যাক্ট পাস হয়। এ সমস্ত আইনের মাধ্যমে আমেরিকায় অভিবাসন সম্পর্কিত বিষয়াবলি নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী ১৫৬৭–৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনেক মূর এবং টার্কি অভিবাসীদেরকে আমেরিকা আনা হয়। এরা সকলেই মুসলমান ছিলেন এবং এদেরকে ক্যারোলিনার আপালাচিয়া পার্বত্য এলাকায় বসবাসের সুযোগ দেয়া হয় এবং এরা সেখানে আন্তঃবিবাহের মধ্যে একটি মিশ্র সম্প্রদায় তৈরি করে। এ ছাড়াও প্রাথমিক যুগে মিশরের

www.waytojannah.com

নাসেরুদ্দীন, বাংকার হিলের যোদ্ধা পিটার সালেম, গিনি–কোনার্কির বেন আলীসহ অন্যান্য মুসলিমদের নাম পাওয়া যায়। বেন আলীকে বিলালী নামেও অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন বর্তমান গিনি–কোনার্কির বাসিন্দা যার সাবেক নাম হচ্ছে ফুতা–জাল্লন (Futa-jallon)। ১৮২৯ সালে তিনি তের পাতার একটি আরবি 'রিসালা' লিখেন, যেখানে মুসলমানদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় অত্যাবশ্যকীয় (ফরজ) কার্যক্রম, যেমন—অজু, গোসল, নামাজ, রোজা ও অন্যান্য বিষয়াবলি সম্পাদনের নিয়মকানুন লেখা আছে।

আমেরিকাতে বর্তমানে চার ধরনের মুসলমান রয়েছে।

প্রথমত : যেসব মুসলমান যাদের পূর্বপুরুষ কোনো মুসলিম দেশের মুসলিম বাসিন্দা ছিল এবং দেশ ত্যাগ করে আমেরিকাতে অভিবাসিত হয়েছে, তাদের বংশধরগণ।

দ্বিতীয়ত : কৃষ্ণাঙ্গ নওমুসলিম বা বেলালী মুসলিম। এরা প্রথমে এলিজা নামক এক ব্যক্তির অনুসারী ছিল, যে আদতেই মুসলমান ছিল না। পরে ভুল বুঝতে পেরে দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে সঠিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

তৃতীয়ত : যেসব মুসলিম যারা কোনো মুসলিম দেশের অধিবাসী কিন্তু চাকরি, ব্যবসা বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকাতে বসবাস করছে।

চতুর্থত : শ্বেতাঙ্গ মুসলিম। এরা আমেরিকারই অধিবাসী। যারা বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের দাওয়াত ও তালিমের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আমেরিকায় বসবাসকারী বা অবস্থানগত দিক থেকে সেখানকার মুসলমানদেরকে এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় অনুশীলনের দিক থেকে এরা আবার সুন্নি, শিয়া, আহমাদিয়া বা কাদিয়ানি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। তবে এদের মধ্যে সুন্নিরাই মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুন্নিদের যারা হানেফি, শাফেয়ি, মালেকি এবং হাম্বেলি এই চারটি মাজহাব বা School of Thought-এর অনুসারী তাদেরকেই সুন্নি হিসেবে অভিহিত করা হয়। এরা আমেরিকার মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা ৮৮%। শিয়া ও কাদিয়ানিদের সংখ্যা খুবই কম আর কাদিয়ানিদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয় না। যদিও কাদিয়ানিরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে।

কালক্রম অনুযায়ী আমেরিকায় মুসলিম অধিবাসীদের শ্রেণী বিভাগ : আমেরিকায় যে সমস্ত মুসলিম অভিবাসিত হয়েছেন তাদেরকে কালক্রম অনুযায়ী মূলত দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমত : ১৮০০ শতকের পূর্ববর্তী সময়ে যাদের আগমন ঘটেছে তাদেরকে 'প্রথম পর্যায়ের অভিবাসী' বা Immigrants of first stage বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত : অষ্টাদশ শতকের পরে যাদের আগমন ঘটেছে তাদেরকে 'আধুনিক অভিবাসী' বলা যেতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ের অভিবাসীদের অনেকেই slave বা ক্রীতদাস ছিলেন। এদের অধিকাংশকেই আফ্রিকান দেশসমূহ হতে আমদানি করা হতো। ঐতিহাসিক সূত্রমতে ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যে আফ্রিকা থেকে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) ক্রীতদাস আনা হয়েছিল, যাদের ন্যূনতম ৩০–৩৫ শতাংশ মুসলিম ছিল এবং এ সমস্ত মুসলিম ক্রীতদাস তাদের resistance,

www.waytojannah.com

determination and education গুণাবলির জন্য মালিকদের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। এর আগে মূর এবং টার্কি অভিবাসীদের বিবরণ (সপ্তদশ শতাব্দী) পূর্বেই দেয়া হয়েছে। ক্রীতদাসদের অনেকে সেনেগাল, গাম্বিয়া, কোনার্কি এবং আফ্রিকার মুসলিম প্রভাবিত অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ১৮৬৩ সালের ১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন 'Emancipation Proclamation' ঘোষণা করেন। যার ফলে সকল ক্রীতদাস মুক্তি লাভ করে স্বাধীনভাবে আমেরিকাতে বসবাস শুরু করেন। আজকের Black American-গণ অধিকাংশই তাদের অধস্তন বংশধর।

আধুনিক পর্যায়ের মুসলিম অভিবাসী

১৮৪০ সালের দিকে ইয়েমেন, তুর্কি এবং আরব অঞ্চলের অনেক মুসলিম আমেরিকা আসতে শুরু করে। এরা সাধারণত আমেরিকাতে ব্যবসা–বাণিজ্য করত এবং অর্থ উপার্জন শেষে দেশে ফিরে যেত। উনিশ শতকের শেষভাগে আমেরিকা সম্পদ স্থানান্তর বন্ধ করার জন্য এর উপর বিধিনিষেধ জারি করে। ফলে এ সমস্ত লোকজন আমেরিকার ডিয়ারবর্ন, মিসিগান, কুইঞ্চি, ম্যাচাসুয়েটস, নর্থ ডাকোটা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। নিচে আরো কয়েকটি অভিবাসীদের বিবরণ দেয়া হলো :

১৯০৬ সালের দিকে বসনিয়ান মুসলমানরা আমেরিকা আসতে শুরু করে এবং শিকাগো, ইলিয়নস প্রভৃতি স্টেটে বসবাস শুরু করে।

১৯০৭ সালের দিকে পোলান্ডের লিপ্‌কা তাতার মুসলমানরা আমেরিকা আসতে থাকে এবং নিউইয়র্কে বসতি স্থাপন করে।

১৯১৫ সালের দিকে আলবেনিয়ান মুসলমানগণ আমেরিকা আসে।

১৯২০ সালের দিকে ভারতীয় আহমাদিয়া মুসলিমগণ আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে।

১৯৪৫ সালে আরব–আমেরিকান মুসলিমগণ মিশিগানের ডিয়ারবর্নে বসতি স্থাপন এবং মসজিদ নির্মাণ করে।

আমেরিকান মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ : আমেরিকাতে মুসলমানদের কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন আছে। এ সংগঠনগুলো আমেরিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে সেখানকার মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে। নিচে এদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

The Council of American—Islamic Relations (CHAIR)

CHAIR অর্থাৎ The Council of American Islamic Relation হচ্ছে United States-এর সবচেয়ে বৃহৎ মুসলিম সংগঠন যাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আমেরিকান মুসলমানদের 'Civil right' বা নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

The Muslim Public Affairs Council (MPAC)—সংগঠনটির কাজ হচ্ছে মুসলিম পাবলিক সার্ভিস এবং মুসলিম আইডেনটিটি রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য–সহযোগিতা এবং গণমাধ্যমে ইসলামের সত্যিকার ভাবাদর্শ উপস্থাপন করা।

www.waytojannah.com

Contents

The American Islamic Congress বা (AIC)—এটি হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী গোষ্ঠীদের সংগঠন। এরা অভিবাসী ও তাদের ছেলে-সন্তানদের আমেরিকার পরিবেশ ও আচার পদ্ধতির সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং বাৎসরিক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিভিন্ন মুসলিম দেশের মানবাধিকার সম্পর্কেও তারা আলোচনা করে থাকে।

The Free Muslim Coalition (FMC)—এ সংগঠনটি ইসলামের নামে উগ্রতা, চরমপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদ বন্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে কাজ করে থাকে। ইসলামে সন্ত্রাসবাদের স্থান নেই—এই প্রতিপাদ্য জনগণকে বুঝানো এবং তাদের মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী চেতনা সৃষ্টি এদের মূল এজেন্ডা।

American Muslim Political Action Committee (AMPAC)—এই সংগঠনটি ২০১২ সালে একজন বাংলাদেশী আমেরিকান রাজনীতিবিদ মো. রাব্বি আলমের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগঠিত এই সংস্থাটি হচ্ছে আমেরিকার সর্ববৃহৎ গণ-অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আন্দোলনকারী প্রতিষ্ঠান। এ সংগঠনটি আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে ২০১৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল মলে লক্ষাধিক লোকের এক সমাবেশের আয়োজন করে। এর প্রধান কার্যালয় হচ্ছে কানসাস সিটিতে, যা মিসৌরি স্টেটে অবস্থিত। নিউইয়র্ক সিটি এবং মেডিসনে এর দুটি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

আমেরিকান মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ : আমেরিকান মুসলমানগণ দেশের ভিতরে এবং বাইরে মানবতার সেবায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এ লক্ষ্যে তারা আমেরিকাতে অনেকগুলো Charity বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আর্তমানবতার সেবায় সাধ্য মোতাবেক অংশগ্রহণ করা। নিচে এ ধরনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হলো।

Inner-city Muslim Action Network বা (IMAN)—এটি হচ্ছে আমেরিকার অগ্রগামী একটি মুসলিম দাতব্য সংস্থা, যাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন জটিলতা নিরসনকল্পে বিভিন্ন লোককে সহায়তা প্রদান করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমাজের অন্তঃস্থিত সম্ভাবনাসমূহকে কাজে লাগিয়ে মানবতার উন্নয়নে সর্বোচ্চ অবদান রাখা আর এভাবে ইসলামকে জানার ও বুঝার পরিবেশ তৈরি করা।

Islamic Relief USA বা (IRUSA)—এই সংগঠনটি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যার একটি শাখা আমেরিকাতেও আছে। এ সংগঠনটির লক্ষ্য হচ্ছে 'To alleviate the suffering, hunger, illeteracy, and diseases world-wide without regard to color, raceor creed.' এ সংগঠনটি সাহায্য প্রদানের সাথে সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনাও নিয়ে থাকে। এ সংগঠনটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করে আবার অসহায় এতিমদের উন্নয়নেও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এদের সাময়িক সহায়তা কর্মসূচিও থাকে। যেমন রমজান মাসে খাবার বিতরণও এদের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এরা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

www.waytojannah.com

Project Down-town : Project Down-town মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত আরেকটি প্রখ্যাত দাতব্য সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে এর প্রথম সূচনা। বর্তমানে পুরো আমেরিকাতে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। খাদ্যের প্যাকেট, হাইজিন ব্যাগ, কাপড়চোপড় এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অসচ্ছল জনসাধারণের মাঝে এরা বিতরণ করে থাকে। বিভিন্ন শহরতলির অসচ্ছল মানুষদের মাঝে এদের বিচরণ, নামেই যার বহিঃপ্রকাশ। এটি একটি Non-profitable বা অলাভজনক সংস্থা। কোরানের বাণীকে তারা তাদের মূল লক্ষ্য স্থির করেছে যা হলো : 'We feed you for the sake of Allah alone, no reward do we seek nor thanks.' (The Quran 76 : 9, সুরা আদ-দাহ্‌র)। অনুবাদ : আমরা শুধু আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের খাবার দিচ্ছি। (বিনিময়ে) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান চাই না—আর চাই না কোনো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আল-কোরান-৭৬ : ৯।

আমেরিকায় মসজিদের সংখ্যা : মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের ইবাদতখানা বা উপাসনালয়। ইসলামে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন যে, নামাজের জামাতে শরিক না হয়ে যারা ঘুমিয়ে থাকে ইচ্ছা হয় তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই কিন্তু শিশু ও নারীদের কথা ভেবে তা থেকে বিরত থাকি।

তাই মুসলমানদের যেখানে আগমন ঘটে তারা সেখানেই একটি মসজিদ বা ইবাদতখানা তৈরি করে। আমেরিকার এমন কোনো স্টেট নেই যেখানে মসজিদ নেই। মহানবী (স.)-এর আরেকটি হাদিসে আছে—তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ইবাদতের জন্য মসজিদ তৈরি করে আল্লাহতায়ালাও তার জন্য বেহেশতে আরেকটি ঘর তৈরি করেন (আল-হাদিস)। তাই মুসলিম জীবনে মসজিদের গুরুত্ব অনুধাবন করেই মুসলমানরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই গমন করে সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করে থাকে। আমেরিকার ৫০ স্টেটের প্রত্যেকটিতে মসজিদ আছে। যে সমস্ত স্টেটে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি সেখানে মসজিদের সংখ্যা বেশি। আর যে সমস্ত স্টেটে মুসলিম বসতি কম সেখানে মসজিদের সংখ্যাও কম। আমাদের সামনে দুটি পরিসংখ্যান আছে। একটি ২০০১ সনের, আরেকটি ২০১১ সনের। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৪ সন থেকে ২৫ শতাংশ হারে মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে। নিচে ৫০টি স্টেটের মধ্যে যেগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মসজিদ অবস্থিত, সে ধরনের ৬টি স্টেটের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো :

স্টেটের নাম	মসজিদের সংখ্যা-২০০১	মসজিদের সংখ্যা-২০১১
নিউইয়র্ক	১২০৯টি	২১০৬টি
ক্যালিফোর্নিয়া	১৪০টি	২৫৭টি
টেক্সাস	২২৭টি	২৪৬টি
ফ্লোরিডা	৬৭টি	১৬৬টি
ইলিয়নস	৫৭টি	১১৮টি
নিউজার্সি	৫৭টি	১০৯টি

www.waytojannah.com

মসজিদ সংশ্লিষ্ট আরো কিছু তথ্য :

❑ যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে প্রতিটি মসজিদের সাথে মুসলিমদের সংশ্লিষ্টতার সংখ্যা ১৬২৫ জন।

❑ মসজিদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নও-মুসলিমদের হার ৩০ শতাংশ।

❑ আমেরিকান মুসলিমদের মধ্যে আমেরিকান প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুসলিমদের অংশগ্রহণকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন এমন মুসলিমদের শতকরা হার ৭০ শতাংশ।

❑ যুক্তরাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক মসজিদে এশীয়, আফ্রিকান-আমেরিকান এবং আরব বংশোদ্ভূত মুসলিমদের হার প্রায় ৯০ শতাংশ।

❑ নিয়মিত মসজিদে যাতায়াতকারীদের জাতিগত উৎস :

দক্ষিণ এশীয় (বাংলাদেশী, ভারতীয়, পাকিস্তানি, আফগানি)	৩৩ শতাংশ
আফ্রিকান-আমেরিকান	৩০ শতাংশ
আরব	২৫ শতাংশ
সাবসাহারা আফ্রিকান	৩.৪ শতাংশ
ইউরোপিয়ান (বসনীয়, টার্টার, কসোভীয় ইত্যাদি)	২.১ শতাংশ
শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান	১.৬ শতাংশ
দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় (মালয়েশীয়, ইন্দোনেশীয়, ফিলিপিনো)	১.৩ শতাংশ
ক্যারিবীয়	১.২ শতাংশ
তুর্কি	১.১ শতাংশ
ইরানি	০.৭ শতাংশ
হিসপানিক/ল্যাটিনো	০.৬ শতাংশ

❑ যুক্তরাষ্ট্রের যে সমস্ত মসজিদ মনে করে তারা কোরান-সুন্নাহ কঠোরভাবে অনুসরণ করে তাদের হার ৯০ শতাংশের অধিক।

❑ যাদের প্রয়োজন তাদেরকে সাহায্য প্রদানকারী মসজিদের হার প্রায় ৭০ শতাংশ।

❑ সার্বক্ষণিক স্কুল রয়েছে এমন মসজিদের হার ২০ শতাংশের অধিক।

আমেরিকান মুসলিমদের বর্তমান জীবনধারা

আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেনীয়রা এবং ব্রিটিশগণ যখন আমেরিকাতে কলোনি স্থাপন করে তখন যে ক্রীতদাসদেরকে আফ্রিকা থেকে আমেরিকা আনা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে আফ্রিকান মুসলমান ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমেরিকান উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে জনবলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ আমেরিকায় অভিবাসিত হতে শুরু করে। এ ধারা স্বল্প পরিসরে হলেও এখনো অব্যাহত আছে। অভিবাসনের এ সুযোগে বিভিন্ন মুসলিম দেশের অভিবাসীরাও আমেরিকাতে বসতি গড়ে তোলে। বর্তমানে সুন্নি-শিয়া মিলিয়ে আরব বংশোদ্ভূত এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানরা এখনো যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম

www.waytojannah.com

সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে থাকলেও ক্রমশ উচ্চশিক্ষিত ও সফল পেশাজীবীরা আমেরিকায় বহু জাতি বহু সংস্কৃতির সম্মিলনে এক আমেরিকান ইসলামের বিকাশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

তা ছাড়া আমেরিকান মুসলিম উম্মাহর এক জটিল সমাজে তুর্কি, পূর্ব ইউরোপীয়, ঘানা, কেনিয়া, সেনেগাল, উগান্ডা, ক্যামেরুন, গিনি, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া, তাঞ্জিনিয়ার মতো আরো অনেক আফ্রিকান দেশের অভিবাসীদের উপস্থিতি দৃশ্যমান। সব মিলিয়ে মুসলিমগণ একটি জটিল মিশ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এজন্য অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন যে, 'It has become a highly diverse and complex society'। তবে অভিবাসী মুসলমানরা একে অন্যের সাথে মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করছে, শুধু তাই নয়, তারা আফ্রিকান আমেরিকান মুসলমানদের বিভিন্ন আন্দোলনের সাথেও সম্পৃক্ত হবার পথ খুঁজছে। ধর্ম ও জাতির মধ্যে সংশ্লিষ্টতা সম্প্রতি আগত আফ্রিকান আমেরিকান অভিবাসীদের কাছে জটিল বলে প্রতিভাত হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব অভিবাসীরা যখন যুক্তরাষ্ট্রে আসে তখন তারা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর অভিবাসীদের মতো কায়িক শ্রম, ছোটখাটো ব্যবসা বা খনি শ্রমিকের কাজ করে নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করে। অনেক আরব মুসলমান ফেরিওয়ালার কাজও নিয়েছিল। কারণ এই কাজে ভাষাজ্ঞান, প্রশিক্ষণ বা পুঁজির কোনোটারই তেমন দরকার হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে রেলপথ সম্প্রসারিত হতে থাকায় অনেকে দল বেঁধে এ কাজে যোগ দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষ অভিবাসীদের সাথে যখন মুসলিম মহিলারা যোগ দিতে শুরু করল তখন তারা কাজ পেল কল-কারখানায়। তাদেরকে সেখানে কঠোর পরিবেশে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হতো। আমেরিকায় মুসলমানদের জন্য প্রথম দিককার বছরগুলো ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাদেরকে নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্য, ইংরেজি জ্ঞানের অভাব এবং বৃহত্তর পরিবার ও সমধর্মের অনুসারীদের স্বল্পতার সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের অবস্থান যতই দীর্ঘ হতে লাগল ততই তারা উপলব্ধি করতে শুরু করলেন যে, তাদের আর দেশে ফেরার সম্ভাবনা তেমন নেই। তখনই তারা আমেরিকার পটভূমিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করলেন। তারা যেভাবেই হোক বিয়ে করলেন। কেউ কেউ স্বদেশ থেকে বিয়ে করে বউ আনলেন। আবার কেউ কেউ বিয়ে করলেন নিজের ধর্মমতের বাইরের মেয়েকে। তারা স্থায়ী চাকরি পেতে শুরু করলেন আবার কেউ শুরু করলেন ব্যবসা। নিজেদের সনাতনী দক্ষতার উপর নির্ভর করে কেউ কেউ রেস্তোরাঁ, কফিখানা, রুটি-বিস্কুটের কারখানা বা মুদির ব্যবসায় নিয়োজিত হলেন, ইংরেজি শিখলেন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অন্যান্য মুসলমানদের সন্ধান করতে লাগলেন। এসব প্রতিষ্ঠানে তাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা দেয়া শুরু করলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের জীবন কখনো সহজ ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে 'অভিবাসীদের দেশ' The country of immigrants এবং 'সকল জাতি ও বর্ণের মিলনস্থল'।

www.waytojannah.com

কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের আগের যুগে এখানে অবশ্যই বর্ণবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ ছিল। সে যুগে অর্থাৎ ১৯৬০-এর নাগরিক অধিকার আন্দোলন শুরুর আগের যুগে মুসলিম অভিবাসীদের নিজেদের ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় গোপন করার প্রয়াস চালাতে হয়েছে। নিজেদের যাতে আরো বেশি আমেরিকান বলে মনে হয় সেজন্য নাম পাল্টাতে হয়েছে। তাদের এমন কোনো কাজ করা বা পোশাক পরা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে যাতে তাদের সাধারণ নাগরিক থেকে পৃথক বলে মনে না করা হয়। ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজ বড় হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য এল। তাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা বাড়ল এবং আত্মোপলব্ধির কথা তারা জোরেশোরে বলতে লাগল। আমেরিকান সমাজে আরো বেশি সম্পৃক্ত হবার প্রচেষ্টায় নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতি বোধ টিকিয়ে রেখে আমেরিকায় বসবাসের গুরুত্ব নিয়ে অধিকতর পরিশীলিত আলোচনা শুরু হলো। এর সূত্রপাত হয়েছে আমেরিকার শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুন্নি ও শিয়া সমাজ গঠন এবং আরো সম্প্রতি জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ধর্মীয় রাজনৈতিক পেশাগত ও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে।

আমেরিকা জুড়ে বসবাস—সারা আমেরিকায় মুসলিম কর্মযজ্ঞ : বর্তমানে আমেরিকাতে এমন কম জায়গাই আছে যেখানে মুসলমানদের বসবাস করতে, জীবিকায় নিয়োজিত থাকতে অথবা তাদের ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুলে পাঠাতে দেখা যায় না। মসজিদের মতো সুনির্দিষ্ট ইসলামি উপাসনালয় এখন সাধারণ ব্যাপার, পুরোনো ভবন সংস্কার করে কিংবা দোকানপাটের সামনে খোলা চত্বরেও নামাজের ব্যবস্থা করা হয়।

আমেরিকায় প্রথম মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে। নর্থ ডাকোটার মুসলমানরা বিশ শতকের গোড়ার দিকে নামাজের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৪ সালে ইন্ডিয়ানায় একটি ইসলামিক সেন্টার কাজ শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম মসজিদটি স্থাপিত হয় আইওয়ার-সিডার র‍্যাপিডসে। এটি এখনো অক্ষত অবস্থায় চালু আছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিয়া-সুন্নি মুসলমানরা দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করে আসছে মিশিগানের ডেট্রয়েট এলাকায়। এদের অনেকেই এখানে এসেছিলেন ফোর্ড মোটর কোম্পানিতে কাজের সুযোগে। এরা এখানে নিজেদের সমাজ গড়ে তোলায় অন্যরাও এখানে আসতে শুরু করে। এভাবে মিশিগান এলাকার মুসলমানরা গড়ে তুলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম মুসলিম বসতি।

বসতি স্থাপনের জন্য আমেরিকার মুসলিম অভিবাসীদের তালিকায় অন্যান্য শহরও রয়েছে। ম্যাসাসুসেটসে বস্টনের উপকণ্ঠে কুইন্সি শিপ ইয়ার্ডে ১৯ শতকের শেষভাগ থেকে মুসলমানরা কাজ করে আসছেন। বর্তমানে 'দি ইসলামিক সেন্টার অব নিউ ইংল্যান্ড' একটি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ কমপ্লেক্স। এটি বর্তমানে শিক্ষক, প্রকৌশলী, বণিক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার লোকজনের সেবায় নিয়োজিত। প্রথমদিকে যে সমস্ত মুসলমান এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তারা যে স্বপ্ন দেখতেন তারই একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি যেন এ সেন্টার।

নিউইয়র্ক নগরীতে ইসলামের উপস্থিতি শত বছরের অধিক কাল ধরে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নিউইয়র্ক অন্যতম বৃহত্তম নগরী। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এক বর্ণাঢ্য উপস্থিতি (A

www.waytojannah.com

colourful presence) এ নগরীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে জাহাজের নাবিক, কারিগর, বিনোদনকর্মী, দক্ষ পেশাজীবী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী। পৃথিবীর প্রায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মুসলমান এখানে বাস করে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মসজিদ নির্মাণের সংখ্যাও বেড়েছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের সুযোগ পেয়েছে। সারা শহরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মুসলিম বিদ্যালয় এবং মুসলিম বিপণি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

অভিবাসী মুসলিমদের আরেকটি আদিনিবাস হলো ইলিনয়ের শিকাগো। অনেকে দাবি করেন যে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকার অন্য শহরের চেয়ে এখানেই ছিল বেশি সংখ্যক মুসলমান। বর্তমান শিকাগোতে বাস করছেন মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্য যে কোনো স্থানের মুসলমান। তারা সমাজে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের ধর্ম প্রসারের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা যেমন একে অপরের সঙ্গে তেমনি অমুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকেন। চল্লিশটিরও বেশি মুসলিম সংগঠন স্থাপিত হয়েছে বৃহত্তর শিকাগো এলাকায়।

অনুরূপভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার মুসলমানরা লস অ্যাঞ্জেলস ও সানফ্রান্সিসকোর মতো শহরগুলোতে তাদের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন। এখানেও বসবাস করে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশের মুসলিমগণ। সম্প্রতি আফগান, সোমালি এবং অন্যান্য আফ্রিকান দেশের মুসলমানরা এদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। 'দি ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া' দেশের অন্যতম একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এর সুদক্ষ কর্মীরা তাদের লেখালেখি এবং সামাজিক নেতৃত্বদানের জন্য সুপরিচিত। অভিবাসী মুসলিম সমাজের প্রয়োজনীয় সব সেবাই প্রদান করা হয় কেন্দ্রের আকর্ষণীয় ভবনটি থেকে।

বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমেরিকান মুসলমান : আধুনিককালের মুসলিম অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে নানা চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন উপায়ে মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। অনেক আমেরিকান মুসলমানের কাছে পরিচয়, পেশা, ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সমস্যাগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মুসলমান ও অন্যান্য আমেরিকান মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক কী হবে, নিজেদের ছেলেমেয়েদের কোথায় ও কীভাবে ইসলামি শিক্ষা দেয়া যাবে এবং মহিলাদের যথাযথ ভূমিকা ও সুযোগ-সুবিধা কী হবে—এগুলো তাদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে। অনেক মুসলমান আমেরিকান মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অবস্থা থেকে সরে এসে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

আমেরিকার মুসলমানরা মনে হচ্ছে তাদের পরিচয়ের আরেকটি ধাপে উন্নীত হতে যাচ্ছেন, যেখানে এসব প্রশ্ন নতুন ও সৃজনশীল উপায়ে সমাধান করা হচ্ছে। এর ফলে হয়তো বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও নৃতাত্ত্বিক পটভূমির মানুষের সংশ্লেষণে সত্যিকারের এক আমেরিকান ইসলামের অভ্যুদয় ঘটবে। এরই প্রক্রিয়া এখন চলছে।

www.waytojannah.com

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বোমা হামলার পর আমেরিকার মুসলমানদের অবস্থা (American Muslim life after 9/11 attack)

আমেরিকাতে মুসলমানদের জীবনধারা কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম থেকেই মুসলমানরা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করে তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। সময়ের বিবর্তনে 'এই মুসলিম সমাজ বর্তমানে আমেরিকার একটি অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী সম্প্রদায়। কিন্তু নাইন ইলেভেনের বোমা হামলা আমেরিকার মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনে এক অভাবিতপূর্ব সঙ্কট সৃষ্টি করে।

২০০১ সালের নাইন-ইলেভেন ঘটনার পর আমেরিকানগণ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ শুরু করে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের এবং দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী মুসলমানদেরকে তাদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে। আমেরিকার Applied Social Psychology জার্নাল তাদের এক গবেষণায় এটা প্রমাণ করে যে, ৯/১১-এর পরে মুসলমানদের উপর আক্রমণ ৩৫৪ থেকে ১৫০১টি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিকভাবেও তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে, যাতে অনেকের প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাণহানিও ঘটেছে। জরিপে এমন তথ্যও বেরিয়ে আসছে যে, ৫৩% আমেরিকান মুসলমান মনে করে যে, ৯/১১-এর পরে মুসলমান হিসেবে আমেরিকাতে বসবাস করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। ১৯ শতাংশ আমেরিকান মুসলিম তাদের প্রতি অসম আচরণের অভিযোগ করেছে। আমেরিকার ৭৬ শতাংশ মুসলিম সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুসলিম সন্ত্রাসবাদের উত্থানে তাদের দুশ্চিন্তার কথা উল্লেখ করেছেন।

নাইন-ইলেভেনের আক্রমণের পরে আমেরিকান উগ্রবাদীদের হাতে অনেক মুসলিম মহিলারাও লাঞ্ছিত হয়েছেন, বিশেষ করে যারা 'হিজাব' পরিধান করেন। এ কারণে অনেক মুসলিম মহিলা 'হিজাব' পরিধান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ২০০৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে এক হিজাব পরিহিতা মুসলিম মহিলা যখন তার বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে গুলি করা হয় এবং এতে তিনি নিহত হন।

আমেরিকান সরকার সকলকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছে এবং আইনের প্রতি অনুগত থেকে সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সংঘটিত ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে অপরাধীকে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছে।

আমেরিকায় ইসলামি উগ্রবাদ : আমেরিকাতে ইসলামি উগ্রবাদীদের বিভিন্ন গ্রুপ রয়েছে যারা আমেরিকাতে অবস্থান করে আল-কায়েদার উগ্রপন্থী দলকে জনবল সরবরাহ ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে আমেরিকান সরকার এদের অনেককে চিহ্নিত করেছে এবং এদেরকে ধরে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। আল-কায়েদা এবং তালেবানের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

www.waytojannah.com

❑ জন ওয়াকার লিন্ড : একজন আমেরিকান মুসলিম। তাকে তালেবানকে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং কারাদণ্ড দেয়া হয়।

❑ জোশে পাডিলা : একজন অভিবাসী হিস্পানিক আমেরিকান। তাকে 'dirty bomb' আক্রমণের সন্দেহে গ্রেফতার করে বিচার করা হয় এবং কারাদণ্ড দেয়া হয়। সে আল-কায়েদার সদস্য ছিল।

❑ Buffalo six : একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ। আল-কায়েদাকে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান সরবরাহ করার অভিযোগে এদেরকে কারারুদ্ধ করা হয়।

এ ছাড়াও আইসান ফারিস, আহমেদ ওমর আবু আলী এবং আলী আল তামিমী আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং এরা আমেরিকার অভ্যন্তরে নাশকতার পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ছিল। এরা আল-কায়েদার জন্য আমেরিকা থেকে জনবল সরবরাহ করত। এদের সবাইকে আমেরিকার কাউন্টার টেরোরিজম ফোর্স শনাক্ত করে এবং প্রত্যেকের কারাদণ্ড হয়।

এভাবে আমেরিকান সরকার মুসলিম উগ্রবাদীদের সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমেরিকায় ইসলাম এবং মুসলমানদের আগমন ও বিকাশ ইতিহাসের পাতায় একটি নতুন অভিযোজন। ইতিহাসের বিস্তর পথ পাড়ি দিয়ে আজকের শক্তিশালী আমেরিকা গঠনে তারাও এক গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। যাত্রাপথে অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আজকে মুসলমানগণ আমেরিকার একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়। ২০০২ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে আফগান দূতাবাসে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ মন্তব্য করেন যে, 'আমাদের সহযোগী আমেরিকানদের এটা অনুভব করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমেরিকান মুসলিমরা আমাদের সাথে আমাদের দেশের ঘটনাবলির কারণে সৃষ্ট দুঃখের সমঅংশীদার, তারাও আমেরিকা সম্পর্কে একই গর্ব অনুভব করে, যে গর্ব আমি আমেরিকা সম্পর্কে অনুভব করি। তারাও আমাদের দেশকে তেমনি ভালবাসে যেমনটি আমি আমাদের দেশকে ভালবাসি।' তাই আমেরিকাকে ভালবেসে উন্নত সভ্যতার উত্তরাধিকারী মুসলিম সমাজ সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে সর্বোচ্চ অবদান রেখে বিকশিত হবে—এটাই সময়ের দাবি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। (ক) উত্তর আমেরিকার ভৌগোলিক পরিচয় দাও।
(খ) উত্তর আমেরিকার প্রদেশগুলোর অবস্থান বর্ণনা কর।

২। (ক) প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশগণ কয়টি স্টেটে কলোনি গড়ে তোলে। প্রাথমিক কলোনিগুলোর ৪টির নাম লেখ।
(খ) আমেরিকার জাতীয় পতাকার ব্যাখ্যা দাও।

www.waytojannah.com

৩। (ক) আমেরিকায় মুসলমানদের আগমনকে প্রধানত কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়?
(খ) সাল উল্লেখপূর্বক ৪টি অভিবাসী আইনের নাম লেখ।

৪। (ক) অবস্থানগত দিক থেকে আমেরিকার মুসলমানদের যে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তাদের বর্ণনা দাও।
(খ) ধর্মীয় অনুশীলনের দিক থেকে আমেরিকার মুসলমানদের পরিচয় দাও।

৫। (ক) আধুনিক পর্যায়ে মুসলিম অভিবাসীগণ আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে আবাসন গড়ে তোলে?
(খ) ১৯০৬ খ্রি. থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কোন দেশের মুসলিম অভিবাসীগণ কোন কোন এলাকায় বসতি স্থাপন করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আমেরিকায় মুসলমানদের আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। আমেরিকার মুসলমানদের বিবর্তন ও বর্তমান জীবনধারার উপর একটি রচনা লেখ।

৩। 'The history of the United States is the history of immigration'— আমেরিকার উন্নয়নে মুসলিম অভিবাসীদের অবদান উল্লেখপূর্বক Eline Kirn-এর উপর্যুক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪। আমেরিকান মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের দ্বারা পরিচালিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ দাও।

৫। ২০০১ সালের নাইন-ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলার পর আমেরিকান মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দাও।

৬। 'আমেরিকায় মুসলমানদের জীবন কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সময়ের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে তারা অগ্রগতির পথে ধাবমান।'—উক্তিটির আলোকে আমেরিকার মুসলমানদের জীবন-সংগ্রামের বিবরণ দাও।

www.waytojannah.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার

(আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচিতি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার, উপসংহার)

আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা : 'দি রেড সি' বা লোহিত সাগরের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত আফ্রিকা পৃথিবীর একটি প্রাচীন মহাদেশ। একসময় এটিকে Dark Continent বা 'অন্ধকার মহাদেশ' বলা হতো। কিন্তু আজকে এ মহাদেশ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। এখানকার অধিকাংশ জায়গায় বর্তমানে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে। আফ্রিকা মহাদেশের মোট আয়তন হচ্ছে এক কোটি বারো লক্ষ বাষট্টি হাজার বর্গমাইল যা সম্মিলিতভাবে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ, ভারত ও চীন দেশের সমান। সাধারণভাবে আফ্রিকার জনসমষ্টি তিনটি প্রধান উপজাতিতে বিভক্ত। এরা হলো হেমীয় (Hamits), নিগ্রো ও বান্টু। এ ছাড়া আরো একটি জাতি আছে তাদেরকে Bushman বা বুনো আফ্রিকান বলা হয়। এই উপজাতিগুলো আবার এত অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত যে, ভাবতেও অবাক লাগে। এখানে প্রায় সাতশ মূল ভাষা প্রচলিত এবং অনেক ভাষার বর্ণমালাও নেই। ধর্মীয়ভাবে এরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—মুসলমান, প্রকৃতি পূজক ও খ্রিস্টান।

আফ্রিকাকে প্রধানত দুটি ভাগে (পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার রাজনৈতিক বিভাজন ব্যতিরেকে) বিভক্ত করা হয়—উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। 'সাহারা' মরুভূমির ভৌগোলিক অবস্থান আফ্রিকাকে মূলত এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। 'সাহারা'কে বলা হয় বালির সমুদ্র। উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার এ দু'অঞ্চলের মধ্যে সাহারা যেন একটি ব্যবধান–প্রাচীর হিসেবে বিরাজ করছে। ৬৪০ খ্রি. খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রা.)–এর শাসনামলে আমর–ইবনুল–আস সর্বপ্রথম আফ্রিকা অভিযান করে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত মিশর জয় করেন এবং অতি দ্রুততার সাথে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা বিজয় করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মরক্কো পর্যন্ত পৌঁছান। আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আটলান্টিকের সমুদ্রতটে পৌঁছে বিশাল জলধি দেখে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন,

www.waytojannah.com

হে আল্লাহ, যদি এই বিশাল জলরাশি আমার গতিরোধ না করত তা হলে আমি আরো সামনে অগ্রসর হতাম এবং সর্বত্র তোমার মহিমা প্রচারের ব্যবস্থা করতাম। তাই উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল যাকে 'আল মাগরিব' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় সে পর্যন্ত পৌঁছে মুসলিম অভিযান থেমে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচিতি : দক্ষিণ আফ্রিকা বলতে এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নকে বুঝানো হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ছাড়াও কয়েকটি দেশ রয়েছে। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯১০ সালে নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, কেপ অব গুডহোপ এবং ট্রান্সভাল—এ চারটি দেশের সমন্বয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত হয়। নাটাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ছিল স্বাধীন বুয়র রাষ্ট্র। এ দেশের দুটো রাজধানী রয়েছে—একটি প্রিটোরিয়া অপরটি কেপটাউন। প্রিটোরিয়ায় দেশের শাসনতান্ত্রিক সদর দফতর অবস্থিত এবং কেপটাউনে রয়েছে ব্যবস্থা পরিষদ। অন্যান্য অঞ্চলকে বাদ দিয়ে হিসেব করলে এর আয়তন দাঁড়ায় ৪ লাখ ৭১ হাজার ৮ বর্গমাইল (১২ লাখ ১৯ হাজার ৯১২ বর্গকিলোমিটার) বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের জনসংখ্যা হচ্ছে ৪ কোটি ৭৪ লাখ। এদের মধ্যে ৬৮ শতাংশ খ্রিস্টান, অ্যানিমিস্ট ২৯ শতাংশ, মুসলিম ২ শতাংশ এবং হিন্দু ১ শতাংশ। নৃতাত্ত্বিকভাবে এদের ৭৯ শতাংশ কৃষ্ণ, সাদা ১০ শতাংশ পীত বর্ণের ৯ শতাংশ ও এশিয়ান ২ শতাংশ।

যে চারটি প্রদেশের সমন্বয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত তন্মধ্যে কেপ প্রদেশ হলে সবচাইতে আয়তনে বৃহৎ অর্থাৎ ২,৭৭,১১৩ বর্গমাইল। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে প্রদেশের জনগণ সর্বাপেক্ষা কৃষ্টিসম্পন্ন ও সুসভ্য। ইউরোপীয় সভ্যতার বুনিয়াদের উপ এখানকার কৃষ্টি–সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এ প্রদেশের অধিকাংশ স্থান বেশ উর্বর। এখানকা প্রায় সর্বত্রই পুষ্পের সমারোহ এবং সবুজের শ্যামলিমা নজরে পড়ে। অবশ্য এ প্রদেশের পার্শ্বেই বিখ্যাত 'কালাহারি' মরুভূমির কারণে সুদূরব্যাপী নির্জনতা বিরাজ করছে। এ প্রদেশের রাজধানী কেপটাউন অন্যতম সুদৃশ্য নগরী। আন্তর্জাতিক পরিবেশ এ নগরীকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। নগরীর পশ্চাতেই সমতলশীর্ষ 'টেবল পর্বত' দণ্ডায়মান।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় ইতিহাসের গোড়া পত্তন : দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের গোড়া পত্তন করেন একটি ওলন্দাজ জাহাজের ডাক্তার জ্যান ভ্যান রিবেক। ১৬৫২ সালের ৬ এপ্রিল তিনি 'কেপ' উপদ্বীপে অবতরণ করে তৎকালীন ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে সেখানে একটি যাত্রাবিরতি কেন্দ্র ও সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। হল্যান্ড থেকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোতে পানি, মাংস ও তাজা খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করাই এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য এর অনেক আগেই ব্রিটিশ ও পর্তুগিজ নাবিকরা এখানে এসেছিল; কিন্তু তখন তারা কেউ এ অঞ্চলে অবস্থান করেনি বা কোনো কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেনি। এরপর ক্রমেই ওলন্দাজদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তারা বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে কৃষিখামার প্রতিষ্ঠা করে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা আগন্তুকদের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে টিকতে না পেরে দেশের অভ্যন্তরের দিকে চলে যেতে থাকে।

www.waytojannah.com

এরপর দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজগণের আবির্ভাব হয়। ফলে এক নতুনতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৭৯৫ খ্রি. ব্রিটিশরা ওলন্দাজের কাছ থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ কেড়ে নেয়। ১৮১৪ সালে 'প্যারিস সন্ধি'র মাধ্যমে ওলন্দাজগণ কেপ অঞ্চলে ব্রিটিশদের অধিকার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। অতঃপর ব্রিটিশগণ দলে দলে কেপ অঞ্চল থেকে নাটালের দিকে এগিয়ে যায় এবং তাদের চাপে ওলন্দাজগণ পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ সময় থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় মূলত ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় ওলন্দাজ, ব্রিটিশ ও বান্টু উপজাতিদের মধ্যে।

দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে যেসব ওলন্দাজ বসতি গড়ে তুলেছিল ইংরেজদের ক্রমাগত চাপের মুখে তারা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ১৮৩৬ সালে তারা দলবেঁধে উপকূল এলাকা ত্যাগ করে দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলে গিয়ে 'ভাল্' নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করে। অবশ্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশপথে ওলন্দাজদেরকে 'জুলু' উপজাতিদের সাথে সংঘর্ষ করে এগিয়ে যেতে হয়। ১৮৩৮ সালে 'ব্লাড রিভার' (রক্ত নদীর) তীরে এক যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে অভিযাত্রী দল জুলুদের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। ১৮৫২ সালে ওলন্দাজ অভিযাত্রীরা আধুনিক ট্রান্সভালে 'দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র' নামে এক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে এবং এর দু'বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের 'অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট'। পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ এ অঞ্চলে ওলন্দাজ ও ব্রিটিশদের মধ্যে তীব্র বিরোধ চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ১৮৭৭ সালে ব্রিটিশগণ ওলন্দাজদের দ্বারা শাসিত 'দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র' দখল করে নেয়। এর কিছুদিন পর অরেঞ্জ নদীর তীরবর্তী এলাকায় হীরার খনি এবং ট্রান্সভালে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে আফ্রিকার এ অঞ্চলের প্রতি স্বভাবতই সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এভাবে এ মহাদেশে বিভিন্ন খনিজ ও বনজ সম্পদসহ অন্যান্য কাঁচামালের লোভে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষলগ্নে এসে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, পর্তুগাল, স্পেন এবং জার্মানির মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশকে একটা তরমুজের মতোই টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে যায় আর আফ্রিকার আদিবাসীরা পরিণত হয় নিজ দেশে পরবাসী ও ক্রীতদাসে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের আগমন : এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৬৪০ খ্রি. মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকা অভিযান করে পুরো উত্তর আফ্রিকা ইসলামি শাসনের ছায়াতলে আনতে সক্ষম হলেও সাহারা মরুভূমির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এবং উপকূলীয় বিপদসঙ্কুল তটরেখা ও অভ্যন্তরীণ দুর্গম ভূ-প্রকৃতি ও ঘন জঙ্গল-বনাঞ্চল ভেদ করে মুসলমানদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছা সম্ভবপর হয়নি এবং তৎকালীন অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তা সম্ভবও ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের আগমন ঘটে। যে পদ্ধতিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন ঘটে তা হচ্ছে ইতিহাসের এক করুণতম অধ্যায়। যার বিবরণ হয়তো অনেকের কাছে অজানা অথবা অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এটাকে উপেক্ষা করে গেছেন। কেননা এ ঘটনার সাথে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের একটি কলঙ্কময় অধ্যায় জড়িয়ে আছে।

ইসলামের আবির্ভাবের অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আরব বণিকদের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মালদ্বীপপুঞ্জে ইসলামের বাণী এসে পৌঁছে। এ সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের

www.waytojannah.com

অধিবাসীদের মধ্যে মুসলিম বণিকগণ ইসলামের বাণী তুলে ধরেন। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে আরব ইয়েমেন ও পারস্য থেকে অনেক ইসলাম প্রচারক এসব দ্বীপপুঞ্জে এসে উপস্থিত হন। ৬০০ বছর ধরে আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান এবং এখানে অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তুর্কিরা এশিয়া মাইনর ও কন্সটান্টিনোপল (পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী) দখল করে নিলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে সকল প্রাচীন বাণিজ্য পথ ছিল—তা সবই তুর্কিদের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়। সুতরাং এ সকল পথ দিয়ে প্রাচ্য ভূ-মণ্ডলের সাথে বাণিজ্য পরিচালনা করা ইউরোপীয়দের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন এতই লাভজনক ছিল যে তারা এটা পরিত্যাগ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তারা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্য করার জন্য আরব ও তুর্কিদের পাশ কাটিয়ে নতুন বাণিজ্য পথ আবিষ্কার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ১৪৮৭ খ্রি. বার্থোলোমিও দিয়াজ (Bartholomeu Diaj) নামে এক পর্তুগিজ নাবিক আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ সীমানার 'উত্তমাশা অন্তরীপ' (Cape of the good Hope) প্রদক্ষিণ করে ভারতে আসার একটি নতুন জলপথের সন্ধান লাভ করেন। এর এগার বছর পর ১৪৯৮ খ্রি. ভাস্কো-দা-গামা (Vasco-da-gama) নামক অপর এক পর্তুগিজ নাবিক 'উত্তমাশা অন্তরীপ' অতিক্রম করে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কালিকট বন্দরে আগমন করেন। ইতোমধ্যে স্পেনে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। স্পেনের রানী ইসাবেলা এবং ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে স্পেনীয় খ্রিস্টানগণ সাতশত বছরের অধিকাল ধরে স্পেনে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে সক্ষম হন এবং জ্বালাও-পোড়াও ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বিভীষিকা সৃষ্টি করে স্পেনের সকল মুসলমানকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। স্পেনে মুসলমানদের পরাজয়ে গোটা ইউরোপ ক্রুসেডীয় উন্মাদনায় ভাসতে থাকে। সাথে সাথে পর্তুগিজ বণিকদের বাণিজ্য পথ আবিষ্কারে উৎসাহী হয়ে পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার ১৪৯৩ ও ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারবার আদেশনামা (Proclamation) জারি করে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে বহির্বিশ্বের বণ্টন ঘোষণা করেন। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে উক্ত পোপ পর্তুগালের রাজাকে ইথিওপিয়া, আফ্রিকা, আরাবিয়া, পারস্য, ভারত ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের ও সমুদ্রপথের অধিপতি উপাধিতে ভূষিত করেন। পোপের ঘোষণাকে স্বর্গীয় অনুমোদন হিসেবে গ্রহণ করে পর্তুগিজ ও স্পেনীয় নাবিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়াতে তাদের কর্মতৎপরতা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি করে। ১৪৮৯ খ্রি. ভাস্কো-দা-গামা তিনটি বাণিজ্য তরী এবং ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ক্যাব্রাল (Cabral) ত্রিশটি জাহাজ ও বারোশত সৈন্য নিয়ে কালিকটে পৌঁছেন এবং রাজা জামেরিনের সাথে সাক্ষাৎ করে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অধিকার লাভ করেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকাতে বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৫৫৩ খ্রি. পর্তুগিজগণ ফিলিপাইনসহ মালয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে যে, ঐ সমস্ত এলাকাতে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেখানে সুমাত্রা, বাটাভিয়া, জাভা, মালাক্কা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও শুলু দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম শাসক ও মুসলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান। এমনকি শ্রীলঙ্কাতেও মুসলিম প্রভাব অত্যন্ত বেশি। অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, যদি ষোড়শ

www.waytojannah.com

শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কায় পর্তুগিজদের আগমন না ঘটত তা হলে আজকের শ্রীলঙ্কা অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতো। যা হোক এ সমস্ত এলাকায় খ্রিস্টান অভিযাত্রীগণ মুসলমানদের উপস্থিত দেখে ক্রুসেডীয় উন্মাদনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং মুসলমান ও মুসলিম শাসকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৫০০ শতাব্দীর মধ্যে এসব স্পেনীয় ও পর্তুগীজ নাবিকেরা উন্নত জলযান তৈরি ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র তৈরিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিল এবং হত্যা–লুণ্ঠন ও দাস ব্যবসা ছিল তাদের মজ্জাগত অভ্যাস—সুতরাং তারা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আধিপত্য বিস্তারের মানসে মুসলিম জনপদগুলোর উপর হামলে পড়ে। প্রতিরোধ সংগ্রামে ব্যর্থ জনপদগুলোকে তারা বিধ্বস্ত করে ফেলত এবং নেতৃস্থানীয় মুসলিম যুবকদের বন্দি করে ইউরোপে নিয়ে যেত এবং সামন্ত প্রভুদের খামারে নিয়ে কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করত। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ অঞ্চল ইউরোপীয়দের নিকট পরিচিত হলেও ওলন্দাজদের আগে কেউ এ অঞ্চলে কোনো বসতি গড়ে তোলেনি। ১৬৫২ খ্রি. সর্বপ্রথম একটি ওলন্দাজ জাহাজের ডাক্তার জ্যান ভ্যান রিবেফ কেপ অঞ্চলে অবতরণ করে সেখানে একটি সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার সাথে কয়েকজন মালয়ী মুসলিম বন্দিকে সাথে করে নিয়ে যান। বলা হয়ে থাকে যে, ডাক্তার জ্যান ভ্যান রিবেফের সাথে আগন্তুক মুসলিম বন্দিরা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম মুসলিম অধিবাসী। J. S. Mayson তার 'The Malayas of Cape Town' গ্রন্থে বলেন, "In 1652 a few Malayas of Batavia were brought by the Dutch into the Residency and subsequent settlement of the Cape of good Hope... ' It is possible that these 'Malayas at Batavia' were the first Muslims to come to this country." এভাবে প্রথমত মালয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম বন্দিদের মাধ্যমে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশদের এ অঞ্চলে আবির্ভাবের পর পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে অনেক মুসলিম নেতৃবৃন্দকে 'কেপ' অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হয়। এসব মুসলিম বন্দিদের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। নিচে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন মুসলিম নেতৃবৃন্দকে 'কেপ' অঞ্চলে নির্বাসিত করা এবং তাদের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের বিস্তৃতি লাভের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু তারও কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে মালয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম শাসক ও জনগণ ইউরোপীয়দের জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যদিও এ সমস্ত সংগ্রামে মালয়ী মুসলমানগণ পরাস্ত হয়। পর্তুগিজগণ প্রথমে এসব অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করলেও প্রাচ্যে পর্তুগিজদের একচেটিয়া ব্যবসা–বাণিজ্যের উপর সর্বপ্রথম ওলন্দাজরা আঘাত হানে। ১৬০৫ খ্রি. ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের নিকট থেকে 'অ্যামবয়না' (Amboyna) দখল করে মশলা দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগিজদের স্থলে নিজেদের প্রতিপত্তি স্থাপন করে। ১৬৪১ খ্রি. ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের নিকট থেকে মালাক্কাস দখল করে নেয়। ১৬৩৯ খ্রি. ওলন্দাজরা গোয়া অবরোধ করে এবং ১৬৫৮ খ্রি. তারা পর্তুগিজদের নিকট থেকে শ্রীলঙ্কা দখল করে নেয়। পরবর্তীতে ওলন্দাজগণ সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত

www.waytojannah.com

দ্বীপপুঞ্জে যে সমস্ত মুসলিম শাসক ও নেতৃবৃন্দ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের সবাইকে পরাস্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকার 'কেপ' অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হয়।

১৬৫৮ খ্রি. মারদেকার্সদের নির্বাসন : 'সারাদেকা' একটি ইন্দোনেশীয় শব্দ। যার অর্থ হলো স্বাধীনতা। ১৬৫৮ খ্রি. ইন্দোনেশীয় একটি দ্বীপ 'অ্যামবয়না' হতে একদল মুসলিম স্বাধীনতা কর্মীদেরকে ইউরোপীয়দের নতুন প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকা উপনিবেশে বন্দি করে নিয়ে আসা হয়। এদেরকে তারা 'মারদেকার্স' হিসেবে অভিহিত করত। এদেরকে দক্ষিণ আফ্রিকার কায়িক শ্রমে নিয়োজিত করা হয়। প্রথমে পর্তুগিজগণ এবং পরবর্তীতে ওলন্দাজগণ এই কার্যক্রম গ্রহণ করে। 'মারদেকার্স'দেরকে প্রকাশ্যে তাদের ধর্ম ইসলামের আচারবিধি অনুশীলনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং 'কেপ' কর্তৃপক্ষ অন্যান্যদেরও মুসলমানদেরকে বিরক্ত না করার জন্য নির্দেশ জারি করে।

১৬৬৭ সালে সুমাত্রার অধিপতিদের নির্বাসন : ১৬৬৭ সালে সুমাত্রা দ্বীপের অধিপতিদের রাজনৈতিক নির্বাসন (অরাং চিয়েন) দেয়া হয়। এদের মধ্যে একজন হলেন শেখ আব্দুর রহমান মাতাহীশাহ এবং অন্য জন হলেন শেখ মাহমুদ। এরা সুমাত্রার শাসক ছিলেন। 'কেপ' কর্তৃপক্ষ এদেরকে কেপটাউন থেকে আরো দূরে কন্সতানতিয়াতে পাঠিয়ে দেয়। কর্তৃপক্ষের ভয় ছিল যে এরা কেপটাউন থেকে পালিয়ে যেতে পারেন এবং স্বদেশে ফিরে আবার জনগণকে সংগঠিত করে সংগ্রাম শুরু করতে পারেন। কন্সতানতিয়ার 'Islam Hill' এ এদের স্মৃতিসৌধ আজো এ নির্যাতিত অধিপতিদের সাক্ষ্য বহন করছে।

১৬৮১ সালে 'কেপ অঞ্চল'কে রাজনৈতিক নির্বাসন এলাকা ঘোষণা এবং মালাক্কাসের রাজপুত্রদের নির্বাসন : ১৬৮১ সালে 'ডাচ' কর্তৃপক্ষ 'কেপ' অঞ্চলকে সরকারিভাবে রাজনৈতিক নির্বাসন এলাকা ঘোষণা করে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের যারাই ডাচ কর্তৃপক্ষের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত তাদের সবাইকে বন্দি করে এ অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ১৬৮১ খ্রি. মালাক্কাসের রাজপুত্রদের বন্দি করে 'কেপ'-এ পাঠিয়ে দেয়া হয়। এসব রাজবন্দি দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসিত হয়েও তারা তাদের ইমানি দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি। এসব রাজপুত্র ও বন্দিরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

১৬৯৪ খ্রি. গোয়ার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব শেখ ইউসুফের নির্বাসন : শেখ ইউসুফ ১৬২৬ সালে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ গোয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোয়ার বানতাম অঞ্চলের সুলতানি আকুংয়ের পক্ষ নিয়ে ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। দুইবার তিনি ডাচদের হতে বন্দি হয়েছিলেন এবং দুইবারই তিনি কৌশলে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ১৬৯৪ খ্রি. ডাচরা তাকে ক্ষমা ঘোষণার কথা বলে আত্মসমর্পণে রাজি করায়। তিনি যখন তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য যান, তখন ডাচগণ তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শেখ ইউসুফকে বন্দি করে। প্রথমে তারা তাকে মালয় দ্বীপপুঞ্জের বাটাভিয়ার দুর্গে পাঠিয়ে দেয়। পরে সেখান থেকে শ্রীলঙ্কাতে পাঠিয়ে দেয়। শ্রীলঙ্কাতে তার প্রভাব-বলয় বৃদ্ধির আশঙ্কা করে ডাচগণ তাকে দক্ষিণ ইউরোপের 'কেপ' অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়। কেপ অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়ার সময় শেখ ইউসুফ তার পরিবার-

www.waytojannah.com

পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীসহ বিরাট একটি দলবলসহ 'কেপ' অঞ্চলে গমন করেন। ইতঃপূর্বে এত বিরাট দলবল নিয়ে কোনো মুসলিম নেতা দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসনে আসেননি। বলা হয়ে থাকে যে, শেখ ইউসুফ তার দুই স্ত্রী, বারোজন সন্তান, বারোজন ইমাম এবং তার কয়েকজন বন্ধু ও তাদের পরিবারসহ নির্বাসনে আসে, 'কেপ'–এর গভর্নর সাইমন ভানডের স্টেল (Simon Vander Stel) তাকে 'কেপ'–এ রাজকীয়ভাবে গ্রহণ করেন। 'কেপ' প্রদেশের রাজধানী থেকে দূরে 'ইয়ারস্‌টি' নদীর মোহনার কাছে জান্দব্লেইটে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। 'জান্দব্লেইট' এলাকায় শেখের প্রভাবে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পলাতক ব্যক্তিবর্গ ও দাসগণ 'জান্দব্লেইট' এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। ১৬৯৯ খ্রি. শেখ ইউসুফ মারা যান। তখন গোয়ার সুলতান শেখ ইউসুফের পরিবারকে গোয়ায় প্রত্যর্পণের জন্য ডাচ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ডাচ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দেশে ফিরে আসার অনুমতি দেন। কিন্তু শেখের পরিবারের কেউ কেউ ফিরে এলেও শেখের সহযোগী অনেকে 'কেপ'–এ থেকে যান এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

১৭৮০ সালে বাংলার সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আহ্‌মাদকে নির্বাসন : বাংলার সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা আহ্‌মাদকে ১৭৮০ সালে 'কেপ' অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়। তিনি ছিলেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার ছিনসুরার অধিবাসী। একই বৎসর ইন্দোনেশিয়ার টারলেট দ্বীপপুঞ্জের রাজপুত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে কাদরী আব্দুস সালাম ওরফে তুয়ান গুরুকেও কেপ অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হয়। তাকে 'রবেন' দ্বীপে বসবাস করতে দেয়া হয়। ১৭৯৩ সালে তুয়ান গুরু রবেন দ্বীপ থেকে মুক্তি লাভ করে কেপটাউনের ডর্‌প স্ট্রিটে চলে আসেন। এখানে তিনি একজন মুক্ত মহিলাকে বিয়ে করেন এবং আব্দুল রাকিব ও আব্দুর রউফ নামে তার দুই ছেলে জন্ম লাভ করে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তিনি 'ডর্‌প' স্ট্রিটে জায়গা কিনে নির্বাসিত মুসলমানদের ইসলামি শিক্ষা দানের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি 'আউয়াল মসজিদ' নামে সেখানে একটি মসজিদও স্থাপন করেন। এ সময়ে বাংলার নির্বাসিত নেতা মাওলানা আহ্‌মাদের সাথে তুয়ান গুরুর পরিচয় হয় এবং মাওলানা আহ্‌মাদ তুয়ান গুরুর বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হন। তুয়ান গুরু যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তিনি তার খলিফা হিসেবে মাওলানা আহ্‌মাদকে নিযুক্ত করেন। মাওলানা আহ্‌মাদ তার জীবনের পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে ১৮৪৩ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত একজন শিক্ষক, কাজি এবং ইমাম হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার এবং প্রসারকল্পের সাথে সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের উন্নতির জন্য একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যান।

১৭৮০ সালে ইমাম আসনুনের নির্বাসন : ইমাম আসনুন ১৭৩৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সেলিবিস দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। এ দ্বীপের অধিবাসীদের সাধারণভাবে 'বুঘী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। বুঘীরা জন্মগতভাবে দুঃসাহসী নাবিক ও কঠোর পরিশ্রমী ছিল। বুঘীরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে তারা যেখানেই গমন করত সেখানেই ইসলামের দাওয়াতি

www.waytojannah.com

কাজ পরিচালনা করত। ইমাম আসনুনকে ১৭৮০ সালে একজন ক্রীতদাস হিসেবে কেপটাউনে আনা হয়। সেখানে একজন স্বাধীন মুসলিম মহিলা তাকে ক্রয় করে নেন এবং তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং পরবর্তীতে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইমাম আসনুন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আরবি ও বুঘী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি 'তুয়ান গুরু' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় যোগদান করেন। তিনি মাওলানা আহ্মাদের কাজি এবং আউয়াল মসজিদের ইমামের পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। সেটাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন এবং কেপটাউনের লং স্ট্রিটে কিছু জায়গা ক্রয় করে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে তার ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার প্রথম স্ত্রী সালিয়া মারা যাওয়ার পর সামিদা নামে আরেক মহিলাকে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর নিকট থেকে তিনি অনেক সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি সেসব সম্পদ দিয়ে অনেক মুসলিম ক্রীতদাসকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ১৮৪৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তার আরেক নাম ছিল জ্যান ভ্যান বুঘী। আজো জ্যান ভ্যান বুঘীজ মসজিদ বা The Palm Tree Masjid নামের মসজিদটি তার সাক্ষ্য বহন করে চলছে।

১৯৫৫ সালে Jhon gunther (জন গান্থার) 'Inside Africa' (আফ্রিকার অভ্যন্তরে) নামে যে বইটি লেখেন সেখানে তিনি কেপটাউনে বসবাসকারী মুসলমানদের সম্পর্কে একটি বর্ণনা প্রদান করেছেন। তার এ বর্ণনা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। নিচে বর্ণনাটি তুলে ধরা হলো :

'কেপ প্রদেশে ৪০ হাজার খাঁটি মালয়ী এখনো রয়েছে। একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপেই এরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ধর্মীয় মতবাদের দিক দিয়ে এরা সবাই গোঁড়া মুসলমান। তারা সময় সময় ভারতীয় মুসলমান মেয়েদের বিবাহ করে বটে, কিন্তু কৃষ্ণকায়, আফ্রিকান বা ইউরোপীয়দের সঙ্গে তারা কখনো বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে না। নিজস্ব স্বতন্ত্র অঞ্চলেই এ সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করে এবং তাদের বাসস্থান এলাকায় কয়েকটি মসজিদ রয়েছে। তাদের মেয়েরা সাধারণত পাতলা ওড়না ধারণ করে। এ সমাজের লোকেরা প্রায় ক্ষেত্রেই খুব সৎ, বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত প্রকৃতির।'

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, মুসলমানদের কেন্দ্রীয়ভাবে সংঘটিত ও নিয়ন্ত্রিত কোনো কর্তৃপক্ষ নেই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য। সুতরাং যে কোনো মুসলমান যেভাবেই হোক, যখন কোনো জনপদে পৌঁছেছে তারা সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'মুবাল্লিগ' বা ইসলাম প্রচারে দায়িত্ব পালন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাজ্যহারা সম্ভ্রান্ত লোকজন সুদূর আফ্রিকায় নির্বাসিত জীবনযাপনের মাঝেও ইসলামের প্রদীপ শিখা অমুসলিমদের সামনে তুলে ধরেছেন। আবার অনেকে নির্বাসিত জীবন শেষে স্বদেশে ফিরে আসার অনুমতি পেয়েও ফিরে আসেননি। শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্য তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে যান। যেমন—গোয়ার শেখ ইউসুফের পরিবারের কিছু সদস্য এবং তার সহযাত্রী ইমামগণ, এদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এসব ইমামগণের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ

www.waytojannah.com

আফ্রিকার কেপটাউনসহ অন্যান্য শহরে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ এবং মুসলিম শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসা স্থাপিত হতে থাকে। ১৮৩৪ সালে বন্দি দাসদের মুক্তিলাভের ব্যবস্থা হয় এবং অনেক কৃষ্ণকায়ও ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।

১৭৯৪ সালে কেপটাউনে 'আউয়াল মসজিদ', ১৮০৭ সালে 'The Palm Tree Masjid', ১৮৫১ সালে পোর্ট এলিজাবেথে প্রথম মসজিদ এবং ১৮৫৫ সালে পোর্ট এলিজাবেথের গ্রেস স্ট্রিটে আরেকটি মসজিদ নির্মিত হয়। ১৮৪৯ সালে কেপটাউনে উইটেনহেজ মসজিদ এবং ১৮৫০ সালে কেপটাউনের ক্যাসল স্ট্রিটে একটি 'জামে মসজিদ' নির্মাণ করা হয়। ১৮৬১ সালে পার্ল টাউনে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

১৮০৫ সালে মুসলমানদের জন্য সরকারিভাবে প্রথম কবরস্থান এবং ১৮২৩ সালে দ্বিতীয় কবরস্থান বরাদ্দ দেয়া হয়। কেপটাউনের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তৎকালীন ওসমানীয় সুলতান আবু বকর ইফিন্দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় হানাফি মাজহাবের বিধিবিধান প্রচলন করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

এভাবে নির্বাসিত মুসলিমদের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রাথমিক প্রসার ঘটে। যদি সামাজিকভাবে মুসলমানগণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হতেন তা হলে ইসলাম দক্ষিণ আফ্রিকায় আরো বেশি বিকাশ লাভ করত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব এবং ১৭১৩ সালে বসন্তের প্রকোপে অনেক মুসলিম বন্দি মারা যায়। যার কারণে মুসলিম সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। তা ছাড়া এত উপজাতি, বুনো মানুষ এবং ভাষার বৈচিত্র্য একটি বিশেষ বাধা হিসেবে কাজ করেছে। তবুও এত প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারে মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি রইল আন্তরিক প্রার্থনা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। আফ্রিকা মহাদেশের পরিচয় দাও।
২। আফ্রিকা মহাদেশকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়—আলোচনা কর।
৩। আফ্রিকা মহাদেশকে 'অন্ধকার মহাদেশ' বলা হতো কেন?
৪। কোন মুসলিম সেনাপতি উত্তর আফ্রিকা বিজয় করেন—আলোচনা কর।
৫। মুসলিম স্বর্ণযুগে দক্ষিণ আফ্রিকা বিজিত হয়নি কেন? আলোচনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানদের আগমন ও ইসলামের বিস্তৃতি সম্পর্কে একটি তথ্য–নির্ভর বিবরণ দাও।
২। দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার যে সমস্ত স্বাধীনতাকামী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল তার একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ উপস্থাপন কর।

www.waytojannah.com

চতুর্দশ অধ্যায়

কানাডায় ইসলাম ও মুসলমান একটি পর্যালোচনা

কানাডা : দেশ পরিচিতি

কানাডা উত্তর আমেরিকার একটি ধনী ও উন্নত দেশ, রাশিয়ার পরে এটি হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। কানাডার আয়তন হচ্ছে ৩৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৮৮ বর্গমাইল বা ৯৯ লক্ষ ৮৭৬ হাজার ১৪০ বর্গকিলোমিটার। দেশটির জনসংখ্যা হচ্ছে ৩২.৩ মিলিয়ন বা ৩ কোটি ২৩ লাখ। দেশটির সরকারি নাম কানাডা এবং রাজধানী অটোয়া। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কানাডা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৪৯ সালে নিউ ফাউন্ড ল্যান্ডসহ কয়েকটি এলাকা কানাডার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কানাডায় মুসলমানদের আগমন : কানাডায় মুসলমানদের আগমনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের পুরোনো নয়। কানাডায়, মুসলমানদের আগমনকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং তৎকালীন সময়ে এবং দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরবর্তী সময়ে কানাডায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল অত্যন্ত শ্লথ কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬৭ সালে কানাডা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার চার বছর পর ১৮৭১ সালে সেখানে একটি আদমশুমারি হয়। সেই শুমারিতে কানাডার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র তের জন ইউরোপীয় মুসলমানের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে এডমন্টনে মুসলমানরা প্রথম মসজিদ নির্মাণ করে। সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাতশত জন। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কানাডায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে মুসলমানদের আগমন ঘটে এবং তাদের কানাডায় অভিবাসিত হবার ফলে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে কানাডায় মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে ১০ লাখ ৫৩ হাজার ৯৪৫ জন এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পর মুসলমানরা হচ্ছে কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়।

মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ : বিশেষজ্ঞগণ কানাডায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে দুটি কারণকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর

www.waytojannah.com

মধ্যে প্রথমটি হলো মুসলিম পরিবারে অধিক জন্মহার বা Fertility rate of Muslims family আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অভিবাসন প্রক্রিয়া। সাম্প্রতিককালে They Globe and Mail নামে একটি কানাডীয় জাতীয় পত্রিকা সে দেশে ইহুদি ও মুসলমানদের সংখ্যায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করে। পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী ১৯৮১ সালে কানাডায় ইহুদির সংখ্যা ছিল তিন লাখ এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। অপরপক্ষে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কানাডায় ইহুদির সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৮ হাজার আর মুসলমানদের সংখ্যা ২ লাখ ৫৩ হাজার। বর্তমানেও পরিবর্তনের এ গতি অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলিম জনসংখ্যা সন্তোষজনক হারে বাড়ছে।

দ্বিতীয় প্রধান যে কারণটি উল্লেখ করা হয় তা হচ্ছে অভিবাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ অভিবাসন প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কারণে এ অভিবাসন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন :

(১) উন্নত জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির আশায়, (২) মানসম্মত উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য, (৩) পরিবারের সাথে মিলিত হওয়া ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ, (৪) ভ্রমণ, (৫) নিজ দেশে রাজনৈতিক চাপ ও নিরাপত্তাহীনতা, (৬) বিভিন্ন মুসলিম দেশে গৃহযুদ্ধ ও নির্যাতনের কারণে কানাডায় গমন ও অভিবাসন। ১৯৮০ সাল থেকে কানাডা যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম দেশসমূহের নাগরিকদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সোমালীয় নাগরিকরা জাতিগত দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধে জর্জরিত দেশটি ত্যাগ করে কানাডায় আসতে থাকে। অনুরূপভাবে ১৯৯০ সালে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে বসনিয়া-হারজেগোভিনা স্বাধীনতা ঘোষণার পর ইউরোপের কসাই নামে খ্যাত রদোভান কারাজদিকের নেতৃত্বে শ্লাভগণ যে মুসলিম জাতিগত নির্মূল অভিযান শুরু করে (ethnic cleansing) তার থেকে বাঁচার জন্য অনেক বসনিয়ান কানাডায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে ইরাক, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলবেনিয়া হতে ইয়েমেন অবধি বাংলাদেশ থেকেও বিভিন্ন মুসলিমগণ কানাডায় অভিবাসিত হয়ে সে দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। তৃতীয় যে কারণটি উল্লেখ করা হয় তা হচ্ছে স্থানীয়দের অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ। এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম এমন একটি জীবনাদর্শ যে, যদি এই আদর্শকে কোনো অমুসলিমের সামনে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা যায়, তা হলে সে ব্যক্তি ইসলামের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ইসলামকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির পাথেয় হিসেবে অবশ্যই গ্রহণ করবে। কানাডায় বসবাসরত বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপ অমুসলিমদের মাঝে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন, যার ফলে এর সুফল পাচ্ছেন। আর এজন্য Encyclopedia of Muslim Minorities : Canadian Chapter-এর লেখক কানাডার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ দাউদ হাসান হামদানি বলেন, "Islam has become the fastest growing religion in Canada." অর্থাৎ ইসলাম কানাডাতে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মে পরিণত হয়েছে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি দাওয়াতি কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। আত্মশ্লাঘায় না ভুগে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে, তা হলে এর মাধ্যমে প্রতিটি কানাডিয়ান অমুসলিমদের

www.waytojannah.com

কাছে ইসলামের ঐশী বাণী পৌঁছে যাবে এবং তারা হয়তো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, Candian Charter of Rights and Freedom-এ যে কোনো ধর্ম গ্রহণ এবং ধর্মীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। ঐ চার্টারের 2(a) ধারায় মুসলিম নারী–শিশুদের স্কুল এবং কর্মক্ষেত্রে 'হিজাব' পরার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং সরকারিভাবে সাধারণত সেখানে ধর্মীয় বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় না। সুতরাং মারাত্মক কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হওয়া ব্যতিরেকে মুসলমানরা সেখানে তার দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করতে পারে এবং এ কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

কানাডায় মুসলমানদের আবাসস্থল : কানাডা জুড়ে মুসলমানদের বিচরণ দেখা যায়। তবে কিছু কিছু প্রদেশ এবং পৌর এলাকা রয়েছে, যেখানে মুসলমানদের উপস্থিতি হার অত্যধিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অন্টারিও প্রদেশে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম বসবাস করে। বিশেষত Greater Toronto Area-তে ৪ লাখ ২৪ হাজার ৯২৫ জন মুসলিম বাস করে, যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার ৭.৭ শতাংশ। কানাডার কেন্দ্রীয় রাজধানী অটোয়াতে ৬৫ হাজার ৮৮০ জন লেবানিজ, দক্ষিণ এশিয়ান এবং সোমালি মুসলমান বসবাস করে, যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার ৫.৫ শতাংশ। Greater Montril-এ ২ লক্ষ ২১ হাজার ৪০ জন বিভিন্ন দেশের মুসলিম বসবাস করছে, যা মন্ট্রিলের মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশ। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পৌর এলাকায় যেমন ভ্যানুকুভার (Vancouver) এলাকায় ৭৩ হাজার ২১৫ জন, ক্যালগ্যারিতে (Calgary) ৫৮ হাজার ৩১০ জন, এডমন্টনে (Edmonton) ৪৬ হাজার ১২৫ জন, উইন্ডসরে ১৫,৫৭৫ জন, উইনিপেগে ১১,২৫৬ জন এবং Halftax-এ ৭,৫৪০ জন মুসলিম বসবাস করছেন। সম্প্রতি ক্যালগ্যারি এবং এডমন্টনে অভাবিত অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। উপর্যুক্ত তথ্যগুলো ২০১১ সালে পরিচালিত কানাডার National Household Survey থেকে নেয়া হয়েছে।

কানাডীয় মুসলমানদের সুবিধা-অসুবিধা : কিছু কিছু সুবিধা ও অসুবিধা মিলিয়ে কানাডায় অভিবাসিত মুসলিমরা তাদের জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যারা কানাডায় অভিবাসিত হয়েছিলেন, তারা অধিকাংশই ছিলেন অদক্ষ জনগোষ্ঠী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অভিবাসিত মুসলিমদের অধিকাংশ হচ্ছেন দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত এবং তারা বেশ অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সাথে সেখানে জীবন অতিবাহিত করছেন। কানাডার পৌর এলাকাগুলোতে হালাল খাবারের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু শহরের বাইরের এলাকাগুলোতে 'হালাল' খাবারের অসুবিধা প্রকট। পৌর এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র টরন্টোতে প্রায় চার শতের মতো হালাল খাবারের দোকান রয়েছে। যদিও 'হিজাব' এখানে নিষিদ্ধ নয় কিন্তু কুইবেক প্রাদেশিক সরকার সেখানকার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে হিজাব পরিহিত মুসলিম নারীদের চাকরিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। কানাডার ইমিগ্রেশন মন্ত্রণালয় ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রমে নারীদের মুখমণ্ডল খোলা রাখা বাধ্যতামূলক করেছে, তা ছাড়া কানাডীয় মুসলমানরা ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে রয়ে গেছে। সেখানে তাঁদেরকে সুদভিত্তিক

www.waytojannah.com

ব্যাংক সিস্টেম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবসা–বাণিজ্য পরিচালনা করতে হচ্ছে। আসলে একটি অমুসলিম দেশে অবিমিশ্র ইসলামি ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনযাপন সম্ভব নয়, এর জন্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি ধৈর্য অবলম্বন করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

কানাডায় মসজিদ ও মুসলিমদের বিভিন্ন সংগঠন : মুসলমানরা যেখানেই পদার্পণ করে সেখানে তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে থাকে। কেননা ইসলাম জামাতের সাথে নামাজ আদায় করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সেজন্য কানাডায় মুসলমানরাও সেখানে নামাজ আদায় করার জন্য অনেকগুলো মসজিদ নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি মসজিদ খুবই বিখ্যাত। সর্বপ্রথম ১৯৩৮ সালে এডমন্টনে মুসলমানরা প্রথম জামে মসজিদ নির্মাণ করে। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে বসনিয়াক–আলবেনিয়ান মুসলিমগণ টরোন্টতে আরেকটি জামে মসজিদ নির্মাণ করে। এই মসজিদটি এশিয়ান মুসলিমগণ বসনীয়–আলবেনীয় মুসলিমদের থেকে কিনে নেয় এবং বসনিয়াক–আলবেনিয়ান মুসলিমগণ ৫৬৪ আনেটি স্ট্রিটে বসনিয়াক জামে মসজিদ নামে আরেকটি জামে মসজিদ নির্মাণ করে। এই মসজিদগুলো ওসমানীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে খুবই দৃষ্টিনন্দন শৈলী অবলম্বন করে তৈরি করা হয়েছে। এভাবে কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম অভিবাসিত অঞ্চলে অনেক মসজিদ কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে যেখানে মুসলমানরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যও পথ নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এ মসজিদ কমপ্লেক্সগুলো মুসলিমদের পদভারে সদা জীবন্ত ও কর্মচঞ্চল থাকে।

এ ছাড়াও কানাডাতে মুসলমানদের অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে, যারা বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন উপায়ে কানাডিয়ানদের বিশেষত মুসলিমদের সমাজ সেবা দিয়ে থাকে। হাদিসে আছে, মহানবী (স.) বলেছেন—"এরহাম্ মান ফিল আরদে, ইয়ারহামুকুম্ মান ফিস্ সামায়ে" অর্থাৎ জমিনে যারা বসবাস করছে তোমরা তাদের প্রতি রহম (দয়া) কর তা হলে আসমানে যিনি আছেন অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করবেন। (আল–হাদিস)। হাদিসের মর্মানুযায়ী কানাডায় মুসলমানরা বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে জনসেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কানাডাতে তিন ধরনের মুসলিম সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে এ সংগঠনগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন :

(ক) উদারপন্থী বা Liberal মুসলিম সংগঠন।

(খ) আহলে সুন্নাত ও জামাতপন্থী সংগঠন।

(গ) আহমাদিয়া বা কাদিয়ানি সংগঠন। যদিও মুসলিম বিশ্বে কাদিয়ানিদেরকে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না, তবুও তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে, তাই তাদেরকে এই শ্রেণীবিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। নিচে এ ধরনের কয়েকটি সংগঠনের নাম দেয়া হলো :

ক-উদারপন্থী সংগঠনসমূহের কয়েকটি :

(১) The Muslim Canadian Congress-প্রতিষ্ঠাতা তারেক ফাতাহ।

(২) The Canadian Muslim Union-এর সদস্যরা পূর্বে MCC-এর সাথে যুক্ত ছিল।

www.waytojannah.com

(৩) Muslims for progressive Values-Canada.

(৪) The Coalition for Progressive Canadian Muslim Organizations. সংক্ষেপে CPCMO. এ সংগঠনটি কয়েকটি ক্ষুদ্র সংগঠন, যেমন : (ক) Canadian Thinkers Foram, (খ) Forum for Learring, (গ) Islamic Council for Interfaith Harmony প্রভৃতি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত।

খ-আহলে সুন্নাত ও জামাতপন্থী সংগঠনসমূহ :

(১) Islamic Society of North America (ISNA).

(২) The Islamic Circle of North America (ICNA.)

(৩) The Muslim Association of Canada (MAC)

(৪) The Ummah Maszid (Halifax Muslim Community).

গ-আহমাদিয়া বা কাদিয়ানি সংগঠন :

এ সংগঠনের সদস্যরা মহানবী (স.)-কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করে না। তবুও এরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে। এরা প্রধানত কানাডার দক্ষিণ এন্টারিওতে বসবাস করে। এদের সাথে কানাডীয় সরকারের সুসম্পর্ক বিদ্যমান এবং এরা মানবিক সাহায্য কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। কানাডাতে অবস্থিত 'বাইতুন নূর' এদের সবচেয়ে বড় মসজিদ। কানাডাতে অবস্থিত এদের কয়েকটি সংগঠনের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :

(১) Majlis Khuddamul Ahmadiyya বা (MKA)। এটি আহমাদিয়াদের যুব সংগঠন।

(২) মজলিস আনসারুল্লাহ বা Majlis Ansarullah. ৪০-৪৫ বয়সী এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিগণ এ কমিটির সদস্য।

(৩) লাজনা ইমাইল্লাহ বা Lajna Imaillah. এটি হচ্ছে আহমাদিয়াদের মহিলা সংগঠন। এ সংগঠনের মহিলা সদস্যগণ মহিলাদের মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক সভ্যতার ভোগবাদী দর্শনের প্রলয়োল্লাসের মাঝে একজন মুসলিম হিসেবে ইসলামি জীবনদর্শনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করা এবং ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা একটি কঠিন কাজ। এজন্য কানাডার মুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে যেমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে তেমনি নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে ইসলামি জ্ঞানে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। আর সাথে সাথে অমুসলিমদের সামনে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করে যেতে হবে। এভাবে সুদৃঢ় ইমানি শক্তি কানাডায় ইসলামি জাগরণ সফলতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

www.waytojannah.com

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। কানাডার পরিচয় দাও।

২। কানাডায় মুসলমানদের আগমনকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়?

৩। কানাডায় স্থাপিত কয়েকটি মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। কানাডায় অবস্থিত কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদের নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কানাডায় মুসলমানদের আগমন ও ইসলামের প্রসারের উপর একটি নিবন্ধন রচনা কর।

২। কানাডায় মুসলমানদের বিভিন্ন সংঘটনের কার্যক্রমের বিবরণ দাও এবং মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর।

www.waytojannah.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপসংহার

সোনালি ভবিষ্যতের প্রত্যাশা : একবিংশ শতাব্দী এবং অতঃপর : ইসলাম আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত ও অনুমোদিত একমাত্র জীবনব্যবস্থা এবং ইসলামের মূল চালিকাশক্তি হলো মহাগ্রন্থ আল-কোরান। এই মহাগ্রন্থ আল-কোরান হচ্ছে একমাত্র আসমানি কিতাব যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ যেভাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন সেভাবে অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীতে বিদ্যমান। মুসলমানরা প্রতিনিয়ত তাদের জীবনাচারে এই কিতাবকে অনুসরণ করে থাকে। এই কোরানে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—'সিরু ফিল্ আরদে' অর্থাৎ তোমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ কর। আর বিদায় হজের দিন জাবালে রহমতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে মহানবী (স.) তাঁর অনুসারী সাহাবায়ে কেরামদেরকে বিশ্বখ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ভাষণে নির্দেশ দিয়েছিলেন—"তোমরা যারা আজ এই আরাফাত ময়দানে উপস্থিত আছ—তারা অনুপস্থিত লোকদের মাঝে আমার এই বাণী পৌছে দিবে।" তাঁর এই অমিয় বাণী বক্ষে ধারণ করে সাহাবায়ে কেরাম এবং মুসলমানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন এবং যিনি যেখানে পৌছেছেন তিনি সেই অঞ্চলে ইসলামের ঐ কল্যাণকর আহ্বানকে সেখানকার মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ কথা আমরা সবাই জানি ও মানি যে, ইসলাম হচ্ছে ফিতরাত বা প্রকৃতির ধর্ম। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে তার প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বা ইসলামের প্রতি আনুগত্যের যে মৌল উপাদান সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন, তার কারণেই মানুষ ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আগ্রহশীল, এজন্য হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রতিটি মানব শিশু তার ফিতরাতের ধর্ম নিয়ে অর্থাৎ ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। তার পিতামাতা পরবর্তীতে তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।" এজন্য যখনই কোনো ইসলাম প্রচারক বা দাই কোনো অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে ইসলামের সঠিক রূপরেখা তুলে ধরে—তখন সে অবচেতন মনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং এক সময়ে তা কবুল করে মুসলমান হয়ে যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতো কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলমানদের কোনো প্রচার সংগঠন না

www.waytojannah.com

থাকলেও প্রতিটি মুসলমান মহানবী (স.)–এর বাণীকে বক্ষে ধারণ করে পরকালীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছে এবং এক একজন মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের প্রচারকার্যে নিয়োজিত হয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রচার সংগঠন না থাকার ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে দিয়েছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অহ্‌দানিয়্যত বা একত্বের বাণী ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত ও অনুরণিত হচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন পণ্ডিত ও দার্শনিক এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রধান কারণ হচ্ছে উক্ত ধর্মের সারল্য। একজন অমুসলমান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য তাকে একটি কালেমা পাঠ করতে হয়। আর তা হচ্ছে "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ বা উপাস্য নেই, এবং মোহাম্মদ (স.) হচ্ছেন তাঁর রাসুল বা প্রেরিত পুরুষ।" এ কালেমার প্রথম অংশটি এমন একটি তত্ত্বকথার উপস্থাপন করে যা পৃথিবীর মানবজাতি স্বীকৃত সত্য হিসেবে মানে। আর দ্বিতীয় অংশটি আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি। কেননা প্রতিটি ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ মনে করে যে, আল্লাহ্ যুগে যুগে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁর বিধি–নিষেধ প্রেরণ করে থাকেন। একজন মানুষ কালেমার ঘোষণা দেয়ার পর তাকে ধর্মের আরো পাঁচটি কাজ যেগুলোকে ইসলামের ভিত্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে—তা করার জন্য শিক্ষা দান করা হয়। সেগুলো হচ্ছে : (১) কালেমার ঘোষণা দেয়া, (২) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, (৩) জাকাত প্রদান করা (৪) রমজানের রোজা পালন করা এবং (৫) সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য হজ করা। এ কাজগুলোর তাৎপর্য অনেক বেশি এবং একাজগুলো ইসলামকে একজন মুসলমানের সার্বক্ষণিক জীবনসঙ্গী হিসেবে পরিগণিত করে থাকে।

প্রফেসর টমাস ওয়াকার আর্নল্ড তার 'দি প্রিচিং অব ইসলাম' গ্রন্থে মুসলমানদের জামাতে নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখে আলেকজান্দ্রিয়ার জনৈক ইহুদির ইসলাম গ্রহণের একটি ঘটনার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তি করার লক্ষ্যে উক্ত ঘটনাটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

"মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করতে এবং তাদের ধরে রাখতে দৈনিক পাঁচ বার নামাজের বিধান অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে বলে 'মন্টেস্কু' গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানদের ধর্ম সব সময় তার সঙ্গেই থাকে, আর তা প্রতিদিন একটি পবিত্র ও হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান নামাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আর এ নামাজ উপাসনাকারীকে তো বটেই, তার দর্শককেও প্রভাবিত না করে ছাড়ে না। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণকারী আলেকজান্দ্রিয়ার জনৈক ইহুদি সাঈদ–ইব্‌ন হাসান একটি মসজিদে শুক্রবারের নামাজের দৃশ্যকে তার নিজের ধর্মান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। একদা একটি মারাত্মক অসুখের সময় তিনি স্বপ্নে নিজেকে মুসলমান হিসেবে ঘোষণা করার জন্য একটি নির্দেশ শুনতে পান। (তিনি বলেন) যখন আমি একটি মসজিদে প্রবেশ করলাম, দেখতে পেলাম যে,

www.waytojannah.com

মুসলমানরা ফেরেশতার মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেন আমার নিজের মধ্যে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এরাই সেই সম্প্রদায় যাদের আগমন সম্পর্কে নবী-রাসুল (স.)গণ ঘোষণা দিয়ে গেছেন। যখন খতিব তার কালো পোশাক পরিধান করে আসলেন, আমার মধ্যে একটি গভীর সম্ভ্রম বোধ জেগে উঠল, এবং যখন তিনি তার শেষ বক্তব্যে বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচার ও সদাচার কায়েম করতে এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য দানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তিনি অশ্লীল ও গর্হিত কাজ-কর্ম ও সীমা লঙ্ঘনজনিত সব কাজ-কর্ম নিষেধ করছেন, তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা তা স্মরণ রাখো।'

এরপর যখন নামাজ শুরু হলো, আমি দারুণ বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কারণ মুসলমানদের নামাজের কাতারগুলো আমার নিকট ফেরেশতাদের কাতারের মতো মনে হলো। যাদের রুকু-সিজদার নিকট আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করছিলেন (বলে মনে হচ্ছিল)। আমি শুনতে পেলাম আমার ভিতরেই সেই কণ্ঠস্বর বলছে, 'যদি যুগ যুগব্যাপী আল্লাহ্ শুধুমাত্র দু'বার বনী ইসরাইলিদের সাথে কথা বলে থাকেন, তা হলে তিনি এ জাতির সাথে কথা বলেন প্রতিটি নামাজের সময়।' অতঃপর আমার মনে এ বিশ্বাস নিশ্চিত হলো যে, একজন মুসলমান হওয়ার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।[১] এভাবে ইসলামের যে পাঁচটি 'বেনা' বা মূল ভিত্তি রয়েছে তার সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া যায়। তবে ধর্মীয় আহ্কামসমূহের বিস্তারিত আলোচনার ফলে এটি ইতিহাসের বদলে ধর্মীয় গ্রন্থের রূপ নেবে বিদায় অতিরিক্ত আলোচনা থেকে নিবৃত্ত থাকলাম।

এ কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামের এই দ্রুত প্রচার ও প্রসার কোনো রাজশক্তির আনুকূল্যে হয়নি। এটি হয়েছে ধর্ম প্রচারক, সুফি-সাধক, পীর-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ীদের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে। হাক্কানি পীর ও মাশায়েখদের আস্তানা শত্রবৈরী পরিবেশের মধ্যেও ইসলামের আলোর মশাল পথভ্রষ্ট মানুষের সামনে তুলে ধরছেন এবং প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। এজন্য একজন কবি বলেন—

"আজ সদ সুখুনে পীরাম এক নোকতা মোরা ইয়াদাস্ত, ইসলাম বরবাদ না শুদ, তা মাকীদা আবাদাস্ত।" অর্থাৎ আমার পীরের শত কথার মাঝে একটি কথা আজো আমার মনে আছে, আর তা হচ্ছে পীর-মুর্শিদের এই আস্তানা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন ইসলাম ধ্বংস হবে না।

আগামী শতকে ইসলামের অবস্থান কেমন হতে পারে?

আগামী শতকগুলোতে ইসলাম এবং মুসলমানদের অবস্থান কেমন হবে, তা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বসহ সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে অধিকাংশ বিশ্লেষকদের মতে আগামী শতক হবে ইসলামের স্বর্ণযুগ। যদিও ইরাক ও আফগানিস্তানের ধ্বংসযজ্ঞ, ফিলিপাইনে 'মরো' মুসলিম, ভারতে কাশ্মিরি মুসলমান, রাশিয়ায় চেনেন মুসলিম, চীনে উইঘুর মুসলিম, মায়ানমার বা বার্মাতে রোহিঙ্গা

www.waytojannah.com

মুসলিমসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের উপর দুঃসহ নির্যাতন চলছে, তবুও বিশ্বাস করা যায় যে—এ সমস্ত নির্যাতনের অবসান হবেই হবে এবং বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় এগিয়ে যাবে। ইতিহাসে প্রমাণিত যে, চেঙ্গিস এবং হালাকু খান মুসলিম সভ্যতা ধ্বংসের জন্য সবচাইতে বেশি ধিক্কৃত ও সমালোচিত অথচ তারই অধস্তন পুরুষেরা আবার ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের উৎকর্ষ সাধনে অনেক অবদান রেখেছে। ক্যাপিটালিজম এবং সোশ্যালিজমের ব্যর্থতার পর মানুষ এখন আবার ইসলামি আদর্শের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তাদের আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য ইসলামকে বেছে নিচ্ছে। পৃথিবীর অর্থনৈতিক সূচক, কর্মশক্তি সঞ্চালনের সূচক সর্বোপরি আধ্যাত্মিক শূন্যতা পরিপূরকের সূচক মুসলিম বিশ্বের পক্ষে। তাই ইসলামি অর্থনীতি অচিরেই একটি শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামের রুহানি শক্তিই তার অনুসারীদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এবং ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি ও সাহস যুগিয়ে যাবে।

ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শন ও জীবন বিধান যা প্রতিটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকর। ইসলামের মানব কল্যাণের উগ্রবাসনা তার সবচেয়ে বড় পুঁজি। ইসলাম মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত" বা সৃষ্টির সেরা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সেরা সৃষ্টির সর্বোচ্চ কল্যাণকর বিধিবিধান প্রদান করেছে। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতে চলতি ও আগামী শতকে ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ হিসেবে প্রতিভাত হবে। বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত কারণে আগামী শতক ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসেবে প্রতীয়মান হবে, তার কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে সেগুলো হচ্ছে এই—

(১) অন্যান্য জাতির তুলনায় সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি, (২) মুসলিম তরুণ ও যুব জনশক্তির হার বিশ্বব্যাপী যুব জনশক্তির তুলনায় অনেক বেশি, (৩) মুসলিম বিশ্বে সস্তা শ্রমের কারণে অধিকাংশ বিনিয়োগ মুসলিম বিশ্বে চলে আসার সম্ভাবনা, (৪) তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে মুসলিম বিশ্বের বিশেষ সুবিধা লাভ, (৫) ইতিহাসের অনিবার্য পথপরিক্রমায় ইসলামি মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ, (৬) মুসলিম পারিবারিক সম্পদ ও ওয়াকফ সম্পত্তির অবস্থান, (৭) মুসলমানদের পারিবারিক সুদৃঢ় বন্ধন, (৮) মুসলিম জনশক্তির পরিচালন ও পুনঃহার বিশ্বের অন্যান্য জনসংখ্যার পুনঃস্থাপনের চেয়ে দ্রুত, (৯) পশ্চিমা বিশ্বে পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা এবং আমেরিকান ডলারের পতন।

উপরে ইসলামের পুনরুত্থানের যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে—যদি মুসলমানগণ ইসলামি জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে চলে তবে তাদের অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে এবং বিশ্ববাসী এর থেকে লাভ করতে থাকবে কল্যাণকর জীবনের ফল্গুধারা।

www.waytojannah.com

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-নমুনা

১। বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স.) ইসলাম প্রচার সম্পর্কে কী বাণী দিয়েছেন?

২। ইসলামকে প্রকৃতির ধর্ম বলা হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কোন কোন উপাত্তের ভিত্তিতে মুসলিম চিন্তাবিদগণ আগামী শতককে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের শতক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন—আলোচনা কর।

www.waytojannah.com

গ্রন্থপঞ্জি

www.waytojannah.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. The History of the Arabs—P.K. Hitti.
২. The History of the Saracens—Syed Amir Ali.
৩. Muslim World on the eve of Europe's Expansion—J.S. Saunders.
৪. Inside Africa—Thon Garther—জন গান্থার।
৫. The Preacping of Islam—T.W. Arnold.
৬. Muslim Ummah—Farid Ahmed.
৭. New Light on Central Asia—Dr. Ahmad Hasan Dani.
৮. History of Muslims in South Africa—Ebrahim Mahomed Mahida.
৯. About the U.S.A— Elaine Kern.
১০. Portrait of the U.S.A.—(Executive editor) George Clack.
১১. Islam in America—Jane Smith.
১২. Islam in China—Raphael Israeli.
১৩. Muslims in Western Europe—Jorgen S. Nilesen.
১৪. The Profile of Muslims in Canada—Abdul Malik Mujahidi.
১৫. Islamic Economics : Theory and Practice, Re-defining the Role of Muslim Ummah to Face the Challenge of Golden Age of Muslim World in the 21st Century and Beyond—Prof. Dr. M.A. Mannan.
১৬. রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি—মো. মাহফুজুর রহমান।
১৭. ভারতের ইতিহাস—অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়
১৮. The Historical Role of Islam—M. N. Roy (অনু.)

ম্যাগাজিন

আমেরিকায় মুসলিম জীবনধারা—আমেরিকান অ্যাম্বেসি কর্তৃক প্রকাশিত।
সন্ত্রাসের বেড়াজাল—আমেরিকান অ্যাম্বেসি কর্তৃক প্রকাশিত।

www.waytojannah.com

প্রবন্ধসমূহ

১. Uighurs Versus Afgans—A Review Erich Walberg.
২. Muslim and Multicultaralism is Canada—(Article)
৩. কানাডায় মুসলমান (প্রবন্ধ)—ডা. সুলতান আহমেদ।
৪. Russia's Crimean.Shore?—Nina khrushchev.
৫. মিয়ানমার : সম্ভাবনার দোলাচলে সাম্প্রদায়িকতার আগুন—বরকতুল্লাহ সুজন।
৬. সেনা হত্যার জের—ব্রিটেনে মুসলিম বিদ্বেষ বেড়েছে—তবারুকুল ইসলাম।
৭. Peace Deal for Turkey— Mohammed Ayoob.
৮. মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে হবে—মেহেদী হাসান পলাশ।
৯. মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সংকট—মো. জমির।
১০. Resolving Sectarian Violence in Myanmar—Nehginpao Kipgen.
১১. Myammar Waits for Better Times—Than Htut Aung (ANN/ Eeleven Media Group)
১২. De-Americanising the World—Noam Chomsky.
(অনুবাদ : শেখ নুরুল ইসলাম রানা—বিশ্বকে আমেরিকা বিমুক্তকরণ।)
১৩. রাজনৈতিক সংকট ও নতুন ধারার রাজনীতি—প্রফেসর ড. এম.এ. মান্নান।
১৪. স্মৃতিতে ফিরে ফিরে আসে নাইন-ইলেভেন—শিফারুল শেখ।
১৫. বুশের টুইন টাওয়ার হামলার কৌশল ও কারণ—মুহাম্মদ আলীরেজা।
১৬. মুসলিম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি—জেন. আই. স্মিথ (অনু.) আমেরিকান অ্যাম্বেসি কর্তৃক প্রকাশিত।

www.waytojannah.com

Contents

মোঃ শামছুল আলম
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ১৬ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।

তিনি ১৯৫৯ সালে লক্ষ্মীপুর জেলার ভবানীগঞ্জ গ্রামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ বদিউর রহমান এবং মাতার নাম জয়তুনেন্নেছা। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে হাদিসশাস্ত্রে কামিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ১৯৮০ সালে অনার্স এবং ১৯৮১ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। তাঁর লিখিত আরো কয়েকটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।